দুই টাকা

পরমপূজনীয়

স্বর্গীয় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের

উদ্দেশে শ্রদ্ধাভরে উৎসর্গিত হইল

অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৫৯
অমৃতসর, পাঞ্জাব

নিবেদন

এই লেখাগুলির প্রথম তিনটী প্রথমে ছোট গল্পের আকারে মাসিক 'শ্রীহর্ষ' পত্রিকায় বেরোয় বছর দশেক আগে। সেই সময়ে 'যশোধরা' নামের গল্পটী শ্রদ্ধেয় ৺কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভালো লাগে, তিনি পত্র দেন। তখনই আমি বই আকারে বেরুলে তাঁকে উৎসর্গ করার ইচ্ছা জানিয়েছিলাম। তারপর তিনি কয়েক বছর বেঁচেও ছিলেন। কিন্তু কাগজের দাম ও অন্য অনেক কারণে আমার আর তাঁকে তাঁর জীবিতকালে বইখানি প্রকাশ করে উৎসর্গ করা হয়ে ওঠেনি।

এতদিনে তাঁকে স্মরণ করে বইখানি দিতে পারলাম।

শেষ গল্প দুটীর 'গোবিন্দ' উত্তরা মাসিক পত্রে বেরোয়, 'নারায়ণ, বেণু ও চন্দ্রা' কোথাও বেরোয় নি।

বৈশাখ ১৩৫৬
অমৃতসর, পাঞ্জাব

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

মনের অগোচরে

বিশাখা

পশ্চিমের ছোট সহর। রাধামোহনের প্রকাণ্ড মন্দিরের সংলগ্ন প্রকাণ্ড 'হাবেলী' অথবা বাড়ী। চতুর্দিকে বাগান। তার মাঝে একদিকে কূয়া, তারই কাছে গোশালা। তার ওপাশে কিছু দূরে একটা হাতী চৌবাচ্চা ভরা জল থেকে শুঁড়ে করে জল নিয়ে নিজের মাথায় আর চার ধারে ছিটিয়ে খেলা করছে। তার গলার ঘণ্টাটা সঙ্গে সঙ্গে বাজছে টং টং। তার নাম মোহনদাস।

মন্দিরের সামনে দেউড়ীতে শুভ্র গুম্ফ শ্মশ্রু সমন্বিত গুরু গম্ভীর মূর্তি একটী দারোয়ান বসেছিল। মন্দিরের ভিতরে ভাগবত পাঠ হচ্ছিল।

এমন সময় ঘড় ঘড় শব্দে একটী টাঙ্গা এসে দাঁড়াল, এবং টাঙ্গা থেকে ধূলি ধূসরিত ঘর্মাক্ত কলেবর একটী যুবক তার বাক্স নিয়ে নামল।

চতুর্দিকে তাকিয়ে বাঙালী কারুকে না দেখে সে দরোয়ানকেই অপূর্ব হিন্দীতে বল্লে, 'এ জী ভিতর খবর দেও, শান্তিপুর সে হাম আয়া।'

দরোয়ান বল্লে, 'তুম কোন হ্যায়? সামান হিঁয়া উতারো, বয়ঠো। দু' বাজে পরসাদ মিল যায় গা', মুসাফির কো মিলতা হায়।'

বিব্রত যুবক 'মুসাফির'ভাবে অভ্যর্থিত হতে প্রস্তুত না হয়ে—মন্দিরের প্রাঙ্গণের দিকে অগ্রসর হয়েই দেখতে পেলে তার ভগিনী-পতি গোঁসাইজী মন্দিরের মধ্যে ঠাকুরের সামনে বসে ভাগবত পাঠ শুনছেন।

সে গিয়ে প্রণাম করতেই তিনি শশব্যস্তে বল্লেন, 'আরে এখানে ঠাকুরের সামনে আমাকে প্রণাম কি করে? তারপর তুমি এখানে হঠাৎ? এসো এসো ভিতরে চল।'

মন্দিরের পাশের এক গলিপথ দিয়ে অন্তঃপুর সীমানায় যাওয়া যায়।

গোঁসাইজী ডাকলেন, 'এই গোবিন্দ তোর মাকে ডাক্। তোর বড় মামা এসেছেন।' সেকেলে ধরণের প্রকাণ্ড অদ্ভুত গড়নের বাটীর কোন একদিক দিয়ে একটী পরম সুন্দর বালক ছুটে বেরিয়ে এলো, তার পিছনে ঘোমটা ঢাকা মুখে বিশাখা এসে ভাইকে প্রণাম করলে।

গোঁসাইজী সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি ওকে প্রণাম করলে যে?'

বিশাখা হাসলে, মৃদুস্বরে বল্লে, 'ওযে বড়, দাদা।'

'ওতো আমাকে প্রণাম করলে, না হে কিশোর?'

কিশোরও হাসলে, বল্লে, 'আপনিও যে বড়।'

'তারপর তুমি কি করে এসে পড়লে?' বিশাখা ভাইয়ের পানে চাইল। 'তোকে দেখতে এলাম। কত বছর পরে দেখলাম বে? প্রায় ছ সাত বছর না? আচ্ছা আপনাদের দূর দেশ, বাবা।'

গোঁসাইজী হাসলেন, স্ত্রীকে বল্লেন, 'এখন ওকে জল খাওয়াও তারপর গল্প কোরো।'

গোবিন্দর হাত ধরে কিশোর বিশাখার সঙ্গে অন্তঃপুরে চল্‌ল।

বিশাখার মুখের ঘোমটা কমে গেল। দীর্ঘ দিন পরে ছবির মত ঘটনাসারি সব তার মনে পড়ল; চৌদ্দ বছরে বিবাহ হয়ে সে এখানে এসেছিল, পিত্রালয়ে যাওয়া হয়নি। এই সাত বছরের জীবনে তার নিজের নামও যেন সে ভুলে গেছে!

২

দীর্ঘ সাত বছর আগে মাঘ মাসের এক সন্ধ্যায় স্কুলের প্রাইজে হাত ভরে নিয়ে বিশাখা বাড়ী এসেই শুনলে 'শীগগির করে ওসব রেখে হাত মুখ ধুয়ে নে সাবান দিয়ে।'

হতবুদ্ধি তার হাত থেকে প্রাইজগুলো মা নিলেন, আর পিসিমা মার হাত থেকে নিয়ে রেখে দিলেন কোথায় কে জানে কোন চৌকির ওপর, অথবা আলমারীর মাথায়, কিম্বা লোহার সিন্ধুকের তলায়। সে আর কোনোদিন সেগুলো সব ফিরেও পায়নি, দেখেওনি। সেলাইয়ের প্রাইজ ছিল চমৎকার একটী বাক্স, ইংরাজী বাংলার ফার্ষ্ট প্রাইজ ভাল ভাল বই ছিল। সারাদিন গান অভিনয় খেলা করে যেমন ক্লান্ত ছিল তেমনি ক্ষুধার্ত ছিল, তার চোখে জল এসে গেল। মাকে বল্লে, 'বড় খিদে পেয়েছে।' পিসিমা বল্লেন, 'ওরে ওরা অনেকক্ষণ এসে বসে আছে আগে সেজে নে। একটু পরে খাবার খাস না।' কারা সে আছে, তা বোঝবার আগেই বাবা এসে ডাকলেন, 'কই তোমাদের হল ?'

আর মা পিসিমা সবাই মিলে তাকে সাবান মাখিয়ে চুল আঁচড়ে গহনা কাপড় পরালেন। তারপর বাইরের ঘরে নিয়ে যাওয়া হ'ল। খানিক পরেই ফিরিয়ে আনা হ'ল।

ও তখন প্রাইজগুলো খুঁজে দেখতে গেল রাত্রে। পিসিমা বল্লেন, 'আর প্রাইজ নিয়ে কি করবি ? ওরা মস্ত বড় গোঁসাই, তোকে খুব পছন্দ হয়েছে। কাল সকালে আশীর্ব্বাদ করে যাবে। কিছু নেবেনা। ১৭ই মাঘ বিয়ের দিন ঠিক করে গেল।'

খুড়িমা বল্লেন, 'ওদের হাতী আছে দোরে'—

বিশাখা প্রাইজগুলো খুঁজেই পেল না—মাকে জিজ্ঞেস করলে; বল্লে, 'মা, ফার্ষ্ট প্রাইজ ছিল তুমি দেখলেও না। সব কোথায় গেল খুঁজে পেলাম না।'

মাও বল্লেন, 'আর প্রাইজ না পেলি খুঁজে,—নেই। কত বড় লোকের ঘরে পড়েছিস, ওদের ঘরে তোব ঐ বই আর সেলাইয়ের কিবা দাম।'

পিসিমা বল্লেন, 'পাগলী, নাই দেখলাম তোর জিনিস। কাল ওরা রাধারাণীর সিঁথি পৌছে দিয়ে আশীর্বাদ করবে। সেই তখন দেখবে লোকে, দেখিস্।

পরদিন আশীর্বাদ, তার দুদিন বাদে গায়ে-হলুদ। তারপর তিন-দিনের মধ্যে বিবাহ হয়ে গেল। সাতটী দিন কি রকম হৈ চৈ উৎসব সমারোহের মাঝে ফুলঝুরির মত দীপ্ত ও দ্রুতভাবে কোথায় ঝরে গেল।

১৮ই মাঘ সন্ধ্যায় ট্রেণে সে এসেছিল সেথান থেকে। আর যাওয়া হয়নি। সেই প্রকাণ্ড পুরীর অন্তঃপুরে ছিলেন, এক বৃদ্ধা পিসশাশুড়ী দুচার জন আশ্রিতা মহিলা আর তার স্বামী ও সে।

বাহিরে মন্দিরে রাধামোহনের নিত্য ভোগ-রাগ উৎসবময় সেবা আর অন্তঃপুরে তার অবগুণ্ঠিত নিঃসংঘাত গুরুজনের সেবাপরায়ণ আদেশ-পালক দিনযাত্রা। এর মাঝে তার বোন ললিতার বিবাহ হয়েছে, গোবিন্দের জন্ম হয়েছে। বারবার পিত্রালয় থেকে আহ্বান এসেছে কিন্তু তার যাওয়া হয়নি।

দীর্ঘ সাত বছর পরে সে ভাইকে দেখ্‌ল। পরস্পর অবাক হয়ে চেয়েছিল দুজনে। দু বছরের ছোট মাত্র ছিল বিশাখা। তখন চৌদ্দ বছরের। কত বড় আর কত সুন্দর হয়েছে বিশাখা। বিশাখাও দাদাকে চিনতে পারত না কেউ বলে না দিলে।

আসন পেতে দাদাকে বসিয়ে সে ভাঁড়ার থেকে এক রেকাবী প্রসাদ আর এক গ্লাস সরবৎ এনে রাখল ভাইয়ের সামনে।

কিশোর একটু হাসলে, তারপর বল্লে, 'একটু চা দিবিনি?' অপ্রস্তুত বিশাখা বল্লে, 'দেখেছ, ভুলে গেছি সব। কিন্তু—।' কিন্তু অর্থাৎ চা দেবে কি করে। যদি বা কবে কার জন্য চা এনেছিল সে চা ভাঁড়ারের প্রত্যন্ত সীমায় কানো অস্পৃশ্যলোকে ছিল। কিন্তু পুরানো আমলের কেনা এনামেলের চটা ওঠা পেয়ালা দুটোর কোনো সন্ধানই আর পাওয়া গেল না। অগত্যা পাথর বাটীর পেয়ালাতে করে বিশাখা চা এনে দাদাকে দিল। এবারে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে জিজ্ঞাসা করল, 'সত্যি সত্যি দাদা নিতে এসেছ

'হ্যাঁরে নইলে কি শুধু শুধু এই হাজার মাইল ধূলোয় রোদ্দুরের আরাম খেতে আসি? আমার বিয়ে যে!' কিশোর হাসলে।

'সত্যি? তোমার বিয়ে? মিছে করে বলছনা?' বিশাখা উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

'হ্যাঁরে বিয়ে সত্যিই। বাবা বল্লেন নিজে গিয়ে না আনলে যদি এবারেও ওরা না পাঠায়। তাই এলাম।'

দীর্ঘকাল পরে আনন্দ অভিমান হাসি কান্নার মাঝখানে থেকে যেন বিশাখা আজ হঠাৎ জেগে উঠল।

ভাই বোন মা বাপ সখি বন্ধু কার কথা যে জিজ্ঞাসা করবে সে ভেবেই পায় না। আর সব কথার মাঝে মনে হয়, দাদার এখানে কত কষ্ট হবে। কত অসুবিধা হতে পারে। এলোমেলো অপ্রস্তুতভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'যেতে যদি দেরী হয় দাদা, তোমার কষ্ট হবে তো এখানে থাকতে? আচ্ছা লতির বর কেমন হয়েছে? খুব বিদ্বান নাকি? দাদা তুমি কি করছ ভাই? বৌ কোথাকার মেয়ে ভাই?'

দাদা হেসে উঠে দাঁড়াল, বল্লে, 'আপাততঃ স্নান না করে কষ্ট সত্যি হচ্ছে। তোর ঐ প্রশ্নটির জবাব দিলাম। নেয়ে এলে পরে বাকি জবাবগুলো দেবার চেষ্টা করব।'

'ওমা দেখেছ—কিছু খ্যালই করিনি'—বিশাখাও উঠে দাঁড়াল, অপ্রস্তুত ভাবে।

'খ্যাল কিরে?' দাদা হেসে জিজ্ঞেসা করল।

অপ্রতিভ বিশাখা বল্লে, 'খেয়াল করিনি।'

ছোট ছোট নীচু নীচু ঘরের সামনে সরু থাম দেওয়া দালান পার হয়ে গোবিন্দর হাত ধরে কিশোর প্রকাণ্ড ইঁদারার পাশে পৌছল। বিশাখা তেল আর নিজের গামছা এনে দেয়ালে রাখল, বল্লে, 'দাদা ওঁর কাপড় দোব? পরবে?'

দাদা হাসলে, বল্লে, 'না তোর গামছাও লাগবেনা। আমার কাপড় তোয়ালে বের করে দেনা স্যুটকেশ থেকে।

রাধামোহনের প্রতিদিনের ভোগের প্রসাদ আর আতথির জন্য বিশেষ করে বিশাখার রান্না তরকারী দিয়ে হৃষ্টপুষ্ট আনন্দময় পরিতুষ্ট গোঁসাইজী, কিশোর আর গোবিন্দ খেতে বসলেন। বিশাখা তার ছোট্ট মেয়েটিকে নিয়ে অল্প ঘোমটা দিয়ে ভাইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে বাতাস করতে লাগল।

গোঁসাই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিশোর কি আমাদের দেশে বেড়াতে এলে? কেমন লাগছে?'

একটু হেসে কিশোর বল্লে, 'বেড়াতে আসিনি, আপনাদের আমাদের দেশে বেড়াতে নিয়ে যেতে এসেছি।'

গোঁসাই হাসলেন, 'বটে। কবে?'

'কাল যাব ভাবছি, যদি আপনাদের সুবিধা হয়।'

'সত্যি নিয়ে যাবে? কিরে গোবিন্দ যাবি?'

গোবিন্দ উজ্জ্বলচোখে বল্লে, 'হ্যাঁ বাবুজী কলকত্তা যাব মামাজীর সঙ্গে।'

গোবিন্দর হিন্দিসুর মিশানো কথাতে গোঁসাইজীর কিছুই ভাবান্তর হ'ল না। তিনি অন্নব্যঞ্জন দেবতার উদ্দেশ্যে দিয়ে পরিতুষ্ট চিত্তে আহারে মন দিয়েছিলেন।

এতদিন পরে আজ বিশাখার হঠাৎ মনে হলো, গোবিন্দর কথার সুর তো হিন্দিই, কথাও হিন্দিতে কয় প্রায় সব সময়েই।

গোঁসাইজী বল্লেন, 'আচ্ছা, তুমি ওদের নিয়েই যাও কালকে, আমি তো যেতে পারব না। এখানে অসুবিধা হবে।'

অনুমতি প্রাপ্ত বিশাখার বিবাহের সময়ের বাক্সটি খুলে তাতে কাপড় জামা গহনা গুছিয়ে নিতে সারাদিন কেটে গেল। তার বিবাহের সময়ের যে ফ্যাসানের যা জিনিষ তার সঙ্গে ছিল তাই তার আজো সঙ্গী হ'ল। বডিস্ ব্লাউস্ সায়া তার এখানে কোনোদিন কাজে লাগেনি সবই পড়ে ছিল। পাউডার সেণ্টও লাগেনি শুধু সাবান তেল আল্‌তা সিন্দুরই ওর কাজে লেগেছিল। উপরন্তু ছেলেমেয়েদের রঙীন আঙ্‌রাখা চুড়ীদার পাজামা আর নিজের ওড়না দুটাও বাক্সে নিল।

তার পর দিন চুড়ীদার পাজামা আর লাল জামা পরে গোবিন্দ, আর হল্‌দে ওড়না জড়ানো বৃন্দাবনী ছিটের পাড় শাড়ী পরা বিশাখা দীর্ঘ সাত বছর পরে বাংলাদেশের অভিমুখে ট্রেণে ওঠবার জন্য ষ্টেশনে এলো। রঙীন ফুলদেওয়া কালো বনাতের টুপী মাথায় তসরের লম্বা কোটের ওপর গায়ে সাদা চাদর জড়িয়ে খাটো লাল পাড় ধুতি পরা গোঁসাইজী প্রসন্ন হাসিমুখে ওদের ট্রেণে তুলে দিয়ে চলে গেলেন।

কিশোরের মনে হতে লাগল কোথায় যেন ওদের অমিল রয়েছে, ভাষা স্থান, অথবা আচার ব্যবহারে কে জানে।

বিবাহ বাড়ীর উৎসব সমারোহের মাঝে অকস্মাৎ জননী ডাকলেন, 'ওরে

ও শাখু, শাখু একবার বাইরে আয়; তোর পূজো হয়েছে? তোর সঙ্গে জামাইরা দেখা করতে চাইছেন।

বহুদিন পরে বিশাখা এসেছে পিত্রালয়ে, তারও সব নতুন লাগছে। দেশের লোকের আত্মীয় স্বজনেরও নতুন লাগছে তাকে, সে যেন কোন অচেনা মানুষ।

রাধিকার অষ্ট সখির নামে তাদের বোনদের নাম রেখেছিলেন পিতামহ। খুড়তুতো জ্যেঠতুতো নিয়ে ৬।৭ বোন। চার জনের বিবাহ হয়েছে। সকলেই বাংলা দেশের ছেলে। বহু-শ্রুত-নাম বিশাখার রূপের কথা, ধনের ঐশ্বর্যের কাহিনী বহুদিন যাবৎ দূরবর্ত্তীত্ব তাদের সকলের মনেও কম কৌতূহল সৃষ্টি করে নি।

বিশাখা বেরিয়ে এলো ঠাকুর ঘর থেকে। ছাপা পাড়ের গঙ্গাজলী শাড়ী সাদা সিদে ভাবে পরা। হাতে মোটা মোটা দুটী বালা, গলায় রাধারাণীর প্রসাদী কণ্ঠমালা, শান্ত অপ্রতিভ হাসি মুখ নিয়ে কপাল ঢাকা ঘোমটা মাথায় সে এসে দাঁড়াল জননীর পাশে।

ভগ্নীপতিরা একে একে প্রণাম করলেন।

ললিতা পিছন থেকে বল্লে, 'অত ঘোমটা দিয়েছিস কেন দি'দি, ওরা কি তোর ভাসুর নাকি?'

বিশাখা অপ্রস্তুত ভাবে মুখ তুলতেই ললিতা হেসে উঠল, 'মাগো দিদি যেন সং হয়েছে—। নাকে তেলক দিয়েছিস কেন?'

ভগ্নিপতিরা একটু আশ্চর্য হয়েই ঐ তন্বী তরুণী পরম রূপবতী প্রবাসিনী মেয়েটীর দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে ছিলেন।

সকলেই হেসে ফেল্লেন ললিতার কথায়।

বিশাখা অপ্রতিভ মুখে মৃদুস্বরে বল্লে, 'আমাদের যে তিলক সেবা করতেই হয়।'

মা বল্লেন, 'তাতো বটেই গোঁসাই বাড়ীর নিয়ম যে।' লজ্জিত মুখ বিশাখার পানে চেয়ে ললিতার স্বামী শৈলেন বল্লেন, 'হ্যাঁ আমাদের বাড়ীতেও আগে সকলের তিলক সেবা নিয়ম ছিল। মা মারা গেছেন তাই ওরা জানে না। আসুন বড়দি আপনাদের দেশের গল্প শুনি আমরা।'

অনাধুনিক মন, লজ্জা নিয়ে—অতর্কিতে নব যুগের সংঘাতে এসে পড়া যেন পুরাকালের অপরূপ একান্ত অন্তঃপুরবাসিনী কন্যার মত বিশাখা অত্যন্ত অপ্রতিভ হয়েই ভগিনীপতিদের দিকে চাইল।

শৈলেনও গোস্বামী ঘরেরই ছেলে। সংস্কৃতে এম-এ পাশ করে কোন কলেজে প্রফেসারী করে। আর তিনজন—সুরেশ, অজয়, রমেশ ওরাও সকলেই বিদ্বান, কেউ বি-এ, কেউ এম-এ, সকলের সঙ্গেই তীক্ষ্ণ কথাবার্ত্তা হাসিতে আধুনিক। এমন কি ললিতা শ্বশুরবাড়ী গিয়ে ম্যাট্রীক পাশ করেছে। হয়ত আরো পড়বে।

বিশাখার জননী বল্লেন, 'তুই ওদের খাবার দে—ওরা গল্প করুক।'

বিশাখা কোন সেকালের মাঝ থেকে আসা লজ্জিত তরুণীর মত বল্লে, 'না মা, তুমিই খাবার দাও। আমি জানিনে কি করে দোব। আমি পান সাজি।'

ইতিমধ্যে বিশাখার ছেলেমেয়ে নিয়ে ওরা ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ল।

আকর্ণমূল রাঙা হয়ে বিশাখা শুনল গোবিন্দ বলছে, 'আমার নাম গোবিন্দ হচ্ছে—বহিনের নাম হচ্ছে—যশোদা।'

মৃদু হেসে প্রশ্ন করল কে যেন, 'আর তোমার বাবার নামটী কি হচ্ছে?'

আর একজন কে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের বাড়ীতে কটা হাতী আছে?'

গোবিন্দ অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে বল্লে, 'হাঁথি? আমাদের দুটো হাঁথি আছে। বাবুজীর নাম কিষণলালজী গোঁসাই হচ্ছে। একটা হাঁথি আমাদের হাবেলীতেই থাকে, একটা গাঁয়ে আছে।'

ললিতা আর অন্যসব ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হাসিতে ভেঙে পড়ল। বিশাখার ভগ্নিপতিরাও হেসে ফেল্লেন।

শৈলেন মৃদু হাসি চেপে বিশাখার পানে চাইতেই অপ্রস্তুত হয়ে গেল। সে বল্লে, 'এই খাওনা সব। হৈ হৈ করছ কেন?'

বিশাখা মুখ নিচু করে নিল, তার চোখ জলে ভরে গিয়েছিল।

শৈলেন চা খেয়ে বিশাখার কাছে গিয়ে বসল। তারপর কোন একটা মেয়ের কাছ থেকে তার খুকিকে নিয়ে বল্লে, 'দিদি পান দিন। আর আপনার এই খুকিটা এত সুন্দর এটীকে আমায় দিয়ে দিন না! ঠিক আপনার মতই হবে মনে হচ্ছে।'

কিশোর এসে দাঁড়িয়েছিল গায়ে হলুদের জন্ম মাদুরের উপর। সে খুকিকে নিয়ে বল্লে, 'হ্যাঁ ঠিক শাখীর মতই হয়েছে।'

বিশাখার চোখ নিচু করেই পানে পানে এলাচ দিতে লাগল। শৈলেনের সৌজন্য স্তুতিবাদ তাকে কোনো সান্ত্বনা দিতে পারল না। যেন মনে হতে লাগল সে যেন কত যুগযুগান্তর দূরে রয়েছে এদের থেকে। এরা ওকে ভুলে গেছে, না, ওই এদের থেকে বহু বহু দূরে চলে গেছে!

নতুন বৌ এলো। সেও আধুনিক মেয়ে, আই, এ, পড়ছে। বরণের জন্য বিশাখারা গহনা কাপড় পরতে গেল।

বিশাখার মা এলেন ঘরে,—একটু ইতস্ততঃ করে বল্লেন, 'শাখু, তেলক না পরে কপালে ফোঁটা দে না চন্দনের? সেওতো দেয় লোকে।'

বিশাখা কালো শান্ত চোখ দুটী তুলে মার পানে চাইল, তার মুখে এলো, 'এতে লজ্জার কি আছে মা?' কিন্তু মার অপ্রতিভ মুখ দেখে সে বল্লে, 'আমাদের যে দিতে হয় মা, আমি সাত বছর এক নিয়মে দিয়ে আসছি।'

আমন্ত্রিত নিমন্ত্রিত অভ্যাগত আধুনিক পুরাতনী অতিথি আত্মীয়দের

কয়েকদিন বিশাখার তিলক গোবিন্দর কথা, গোবিন্দদের দুটি হাঁথি, একটা উহু হাসির উপাদান যোগাল। কখনো বাহিরে, কখনো অন্তঃপুরে অট্টহাসি উচ্চহাসির তরঙ্গ ভেঙে পড়ে।

নববধূ ফিরে যাওয়ার সঙ্গে বিশাখারও ফিরে যাওয়ার সময় এলো। মা বাপের ব্যাকুল বিদায় দান, পল্লীর পুরাতন আনন্দময় বহু স্মৃতির মাঝে এবারের বহু নতুন সঞ্চয় নিয়ে বিশাখা গাড়ীতে উঠল সেই বাসন্তী রংয়ের চাদর সেই সাদা বৃন্দাবনী শাড়ী পরে।

ষ্টেশনে এলো শৈলেন। মনের মাঝে কোনখানে তার কাঁটা ফোটে যেন। ঐ অপরূপ আধুনিক যুগের অথচ আত্মবিস্মৃত তরুণী নারীর কাছে তার বরাবরই কি জন্য যেন ক্রটী স্বীকার করতে ইচ্ছা হচ্ছিল। যেন তাকে অসম্মান করেছে ওরা সবাই মিলে।

কিন্তু সে ক্রটীর কথা মুখে বলতে গেলে কিছুই কথা আসে না যে। কিছু বলতে না পেরে অনেকক্ষণ ধরে শুধু শৈলেন খুকিকে নিয়ে আদর করতে লাগল আর গোবিন্দর গল্প শুনতে লাগল।

গাড়ী ছাড়বার সময় সহসা বিশাখাকে সে বল্লে, 'আমাদের মাপ করবেন দিদি। সাহেবরা চার্চে যায়, মুসলমান নমাজ পড়ে, তাতে তারাও হাসে না আমরাও হাসি না। কিন্তু তিলক দেখে আমাদের হাসি পায়। বাঙালীর ঘরে ছোট ছেলে ইংরেজী মিশিয়ে কথা বল্লে, হাসি না। কিন্তু গোবিন্দ হিন্দী সুরে কথা বল্লে সবাই হাসি।

তারপর বিস্মিত বিশাখার দিকে চেয়ে একটু হেসে বল্লে, 'আমি আপনার চেয়ে অনেক বড়, প্রণাম করব না তাই। তবে আপনার বোনের হ'য়ে এই ক্ষমা চেয়ে নিলাম দিদি।

দীপ্ত সুশ্রী মুখ শৈলেন সুন্দর মিষ্ট সৌজন্যময় ব্যবহারে যেন বিশাখাকে জাগিয়ে দিল আর এক জগতে।

দীর্ঘ পথের কষ্টের মাঝে বিশাখার শুধু মনে হচ্ছিল সে যেন কোন নির্বাসিত জগতে বাস করে। কই এতদিন তো একথা তার একবারও মনে হয়নি। বারবার অতিশয় লজ্জিতভাবে তার মনে হয় এ ভাবনা তার অন্যায়, বিশ্রী, অনুচিত। তবু কেন অচেতন মনে তার জাগে কত কি যেন সে পায় নি। কি তা আর তার মনে করতে ইচ্ছাই হয় না জানে না। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সে বাইরের পানে চায়, রুক্ষ উষর প্রান্তর ছুটে পিছিয়ে যাচ্ছে—কিন্তু সম্মুখে এগিয়ে আসছে আবার তেমনি পিঙ্গল মরুক্ষেত্র। মাঝে মাঝে একটী একটী ভুট্টার ক্ষেত কুয়া আসে আর চলে যায়।

সন্ধ্যার সময়ে বিশাখা পৌঁছল বাড়ী। গোঁসাইজী হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভাল ছিলে?' গোবিন্দ পিতার প্রশ্নের জবাব দিল অত্যন্ত উৎসাহে।

অন্তঃপুরের পথ দিয়ে রাধামোহনকে ধূলো পায়ে প্রণাম করে বিশাখা নিঃস্তব্ধ অন্ধকার ঘনিয়ে আসা পুরীর মধ্যে প্রবেশ করল।

যথানিয়মে দেবতার সন্ধ্যারতি হয়ে গেল। ভোগ প্রসাদ গ্রহণ করলে সবাই। গোঁসাইজী অন্তঃপুরে এলেন শয়ন করতে।

বিশাখার যেন কাজ আর শেষ হয় না। ঘরের কোণের অল্প আলোতে এঘর ওঘর বড় দেখা যায় না। গোঁসাইজী স্ত্রীর অপেক্ষা করে ঘুমিয়ে পড়লেন।

বিশাখা কত রাত্রে ছেলেমেয়ের কাছে শুয়ে পড়ল নিজেও জানে না।

সহসা তার ঘুম ভেঙে গেল অত্যন্ত চেনা কি শব্দে। বাইরে মোহনদাস হাতী জেগে উঠেছে, তার গলায় ঘণ্টা বাজছে টং টং।

তার মনে হ'ল, বহু-শ্রুত কথা, তাদের দোরে হাতী আছে।

বিশাখার আর ঘুম এলো না। মোহনদাসের গলার ঘণ্টা থেকে থেকে একই ভাবে বাজতে লাগল।

একটু পরেই কূয়ার লোকেরা কূয়ার বলদ কাজে জুড়ে সুর ধরল—'কীলো ভরিয়ো কূয়া চলিয়ো।'

গোবিন্দর ও খুকুর ঘুম ভেঙে গেল, বিশাখা উন্মনভাবে ওদের পানে চাইল। হঠাৎ তার মনে হ'ল, গোবিন্দকে খুব ভাল করে পড়াবে, খুব বিদ্বান হবে। খুকুকেও বাংলা শেখাবে, বাংলা দেশে বিয়ে দেবে ভালো ছেলের সঙ্গে। না হোক বড়লোক। মনে হয় যেন শৈলেনের মত। তার পরেই অকস্মাৎ অপরাধিনীর মত উঠে দাঁড়াল বিশাখা। পাশের ঘরে গিয়ে দেখলে, গোঁসাইজী গোবিন্দ নাম স্মরণ করে উঠছেন। বিশাখা স্বামীর পায়ের ধূলো নিলে।

গোঁসাইজী 'গোবিন্দ পদে মতি থাক' বলে বল্লেন, 'হঠাৎ প্রণাম?' বিশাখা বল্লে, 'কাল এসে করিনি মনে হচ্ছে।'

ললিতা সখী

সেকেণ্ডক্লাস গাড়ী থেকে নামল কিশোর কিশোরের বৌ, ললিতা তার বর শৈলেন আর ওদের দুটী ছেলেমেয়ে। ষ্টেশনে নিতে এসেছিল গোবিন্দ আর তাদের সরকার শিউপ্রসাদ।

সরু লালপাড় ধুতি, গলাবন্ধ তসরের কোট শুধু গায়ে, মাথায় কালো বনাতের টুপী রেশমের ফুলতোলা, পায়ে ওদেশী জরীর নাগরা—আধা হিন্দুস্থানী আধা বাঙালী সাজে গোবিন্দ দাঁড়িয়েছিল। কিশোরের তাকে দেখে মনে পড়ল পাঁচ বছর আগের কথা, যেদিন সে মিশাথাকে নিয়ে গেল ষ্টেশনে তুলে দিতে এসেছিলেন গোসাইজী অমনি ধরণের সাজে। আজ যেন গোবিন্দও তাঁর ক্ষুদ্র-সংস্করণরূপে এসেছে।

একটু হেসে ফেলে কিশোর বল্লে, 'তুমি গোবিন্দ না? মস্তবড় হয়ে গেছ।'

খাকি সুটপরা ললিতার ছেলে সমীর, চমৎকার হালকা ফ্লানেলের ফ্রক-পরা কিশোরের মেয়ে শিপ্রা আর সুন্দর শাড়ীপরা ললিতা আর কিশোরের বৌ অনিলা নেমে এসে গোবিন্দর কাছে দাঁড়াল।

নিজের জননী ও আত্মীয়াদের অভ্যস্ত সাজ-সজ্জা দেখে গোবিন্দর কাছে যেন এরা একেবারে অজানা বিভিন্ন রকমের মনে হল। হতবুদ্ধির মত অপ্রস্তুতভাবে গোবিন্দ চুপকরে দাঁড়িয়ে রইল।

এবারে জিনিষ নামানোর পর শৈলেন এসে দাঁড়াল গোবিন্দর পাশে। তারপরই তার চোখে পড়ল ললিতার অনিলার সকৌতুক হাসি আর গোবিন্দর অপ্রস্তত মুখ।

শৈলেন গোবিন্দর পিঠে হাত দিয়ে বল্লে, 'চল গোবিন্দবাবু। কোন-দিকে যাব আমরা জানিনা তো।'

শিউপ্রসাদ এগিয়ে এলো, আভূমি নত হয়ে সেলাম করে বল্লে, 'আসেন হুজুর—গাড়ী বাহার আছে।'

গাড়ীতে উঠে শৈলেন জিজ্ঞাসা করলে, 'কৈ তোমার বোনকে আনলে না যে? গোবিন্দ আরক্তিম হয়ে উত্তর দিলে. 'মা বল্লেন সে বাড়ীতে থাক্। সে বাংলা ভালো জানে না।'

রাধামোহনের মন্দিরের সেই পুরাণো-কালের তোরণের মধ্যে দিয়ে গাড়ী এসে দাঁড়াল। তোরণতলে সেই দরোয়ানের খাটিয়া পাতা বিছানা, চৌকির ওপর তুলসীদাসের রামায়ণ। গাড়ী দেখে তারা দু' তিনজন সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। মন্দিরের বিস্তৃত বহিপ্রাঙ্গণের একপাশে সেই মোহনদাস হাতী শুঁড়ে করে জল নিয়ে নিজের মাথায় আর গায়ে ছিটিয়ে স্নান করছে।

দেবতার সমীপে ভাগবত পাঠের কাছে গোঁসাইজীও তেমনি নিবিষ্টমনে পাঠ শুনছেন।

দীর্ঘ ছয় বছর আগের চিত্র যেন হুবহু সেইভাবেই কিশোরের চোখের সামনে ফুটে উঠল।

গাড়ী থেকে অতিথিরা নামল। আঙরাখা ও ঘাঘরা পরা বিশাখার মেয়ে যশোদা সামনের প্রাঙ্গণে খেলা করছিল, ছুটে গিয়ে পিতাকে বল্লে, 'বাবুজী পাহুনা এসেছে।'

গোঁসাইজী হাসিমুখে নেমে এলেন মেয়ের হাত ধরে। বল্লেন, 'পাহুনা নয়—মামা মামী।' গোবিন্দ, তোমার মাকে বলগে ওঁরা এসেছেন।'

ললিতা অনিলা এসে প্রণাম করল। ছোট ছেলে নারায়ণের হাত ধরে বিশাখা অন্তঃপুরের সীমানায় দাঁড়িয়েছিল, পরম আনন্দে উৎসাহে ওদের কাছে এসে দাঁড়াল। গোঁসাইজী সহাস্যে বল্লেন, 'তারপর, আমি তো কারুকে চিনি না, ললিতা সখী কোনটী?

ললিতা ভ্রু-ভঙ্গি করে বল্লে, 'থাক, আমার বুঝি তেমনি চেহারা, মাগো।'

কিশোর বল্লে, 'আপনি বুঝি জানেন না জামাইবাবু আমাদের যে ওখানে সখীভাবে সাধনা করেন, একজন আছেন বেশ একটু গোপ দাড়ি-ওয়ালা। তাঁকে ললিতা সখী বলা হয়।

গোঁসাইজী অবাক হয়ে বল্লেন, 'তাই নাকি? আমি শুনেছি অনেকের কাছে, সত্যি আছেন তবে? ভারি ভক্ত তো?'

কিশোর আর শৈলেন হাসলে। আসলে ভক্তি এবং বিশ্বাস দুই ওদের গোঁসাইজীর মত নয়। শৈলেন বল্লে, 'তা হতে পারেম। আমবা কিন্তু আপনার মত আর বিশ্বাসী ভক্ত কই হলাম। আর আপনার এই ললিতা সখীও মোটেই ওঁর দিদির মত নয়।'

গোঁসাই হাসলেন, বল্লেন, 'তাহলে তোমাকে আমি ললিতা সখীই বল্‌ব।' ললিতা বল্লে, 'বলুন না কথার জবাব পাবেন না।'

এবারে শৈলেন বল্লে, 'চলুন দিদি আপনার বোনের আর ললিতা সখীব গল্পে তো আমাদের ক্ষিদে তেষ্টা মিটবে না।'

স্নানাহার শেষে যশোদাকে নিয়ে ললিতা হেসেই আকুল। 'ভাই, নিজেও যেমন সং সেজে থাকিস এমন সুন্দর মেয়েটাকেও কি তাই সাজিয়ে রাখতে হয়? কেন ফ্রক সেলাই করতেও ভুলে গেছিস?'

বিশাখা অপ্রস্তুত হয়ে হাসলে একটু।

শৈলেন ভ্রূ-কুঞ্চিত করে বল্লে, 'কেন তোমাদের ফ্রকের চেযে এতে বেশী ভাল দেখাচ্ছে।'

ললিতা বল্লে, 'দিদি যা করবে তাই তোমার ভাল লাগবে তা সং সাজানো হলেও।'

ললিতা মাথায় কাপড় দেয় কি না দেয় সকলের সঙ্গেই সমান গল্প করে

—হাসে, কথা কয়, বিশাখা অল্প ঘোমটা টেনে চুপ করে গল্প শোনে। বিশাখার অপ্রতিভ মুখের দিকে সকলেই চাইল। কিশোর বল্লে, 'কিন্তু যাই বলিস তুই, বেশ দেখাচ্ছে ওকে পুতুলের দেশের মেয়ের মত। আমাকে একটা ওই রকম করিয়ে দিস তো ভাই, আমার মেয়েটার জন্যে।'

অনিলা বল্লে, 'তা একদিনই ভালো লাগে ওরকম সাজ।' কিন্তু কথাটার মোড় ফিরুক এ কথা যেন সকলেরই মনে হচ্ছিল—এমন কি কথাটা বলে ফেলে ললিতারও—এবারে শৈলেন বল্লে, 'এখানে কাছাকাছি আজকে দেখবার মত কি আছে?'

গোবিন্দ এতক্ষণ চুপকরে বসেছিল, এবার পরম উৎসাহে মেসোর কাছে এসে বসল। কোথায় রাজপ্রাসাদ কোন পাহাড়ের ওপর কি মন্দির ইত্যাদি—নানা জায়গার নাম বর্ণনা করতে আরম্ভ করল।

বিশাখা বল্লে, 'অন্যসব ঠাকুরদের মন্দিরও দেখতে যেও, অনেক ঠাকুর আছেন।'

ললিতা হাসলে, 'দিদি যেন তেরকেলে বুড়ী—ঠাকুর দেবতার মন্দিরই তোর সব আগে মনে পড়ে।' অনিলা বল্লে, 'আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন তো দিদি?' বিশাখা বল্লে, 'না ভাই আমার সময় হবে না, ঠাকুর ঘরে কাজও আছে—এমনি কাজও আছে।'

শৈলেন বল্লে, 'তাহোক চলুন, একসঙ্গে বেড়াই, আপনি না হয় আগে চলে আসবেন। যান আপনারা তৈরী হন সবাই।'

প্রসাধন শেষ হ'ল, ললিতা অনিলা ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল।

'কই দিদি—তোর হ'ল?'

একখানি সাধারণ সাড়ী সেমিজ পরে একটী বৃন্দাবনী ছাপা চাদর গায়ে দিয়ে বিশাখা এসে দাঁড়াল। মেয়ের গায়ে একটি পুরাতন ছোট ফ্রক প্রায় না-হবার মত। বোধ হয় গত পূজার সময় বিশাখার মায়ের দেওয়া।

শিপ্রা সমীর তাদের পরিচ্ছন্ন সুশ্রী আধুনিক পোষাক পরে এসে দাঁড়িয়েছিল।

কিশোর শৈলেন এসে জিজ্ঞাসা করল, 'হল? চল এবারে!'

ললিতা যশোদার দিকে চেয়ে হেসে ফেললে, 'ওকি সং সাজালি ওকে? ওর কি আর জামা নেই! ওটার পিঠে বোতামও দেওয়া যাচ্ছে না এত ছোট হয়ে গেছে। ও জামার চেয়ে তোর ঘাগরা আঙরাখা ভাল ছিল।'

গোবিন্দর মুখ একেবারে লজ্জায় কি রকম হয়ে উঠল। সত্যি তার মার কি কিছু বুদ্ধি নেই। এই সব সভ্য পরিচ্ছন্ন লোকদের সামনে ওই জামা কাপড় পরে নিজে না হয় বেরিয়েছেন বোনটীকে কি বিশ্রী সাজিয়েছেন?

বিশাখার জবাব দিবার মত কথা ছিল না। এক মুহূর্তেই বোঝা গেল। সে নির্বোধের মত মেয়ের পিঠের বোতাম লাগাতে লাগলো। ললিতার দিকে একবার তাকিয়ে শৈলেন বল্লে, 'কেন বেশ হয়েছে চল চল।' কিশোর যশোদার হাত ধরে এগিয়ে গেল।

বাইরের আঙিনায় গোঁসাইজী দাঁড়িয়েছিলেন। গাড়ীতে উঠতে গিয়ে অনিলা বল্লে, 'দিদি আপনি জুতো পরলেন না?'

জুতো? সকলের নজর পড়ল সকলের পায়ের দিকে।

গোঁসাইজী বল্লেন, 'জুতো? উনি পরেন কি? দেখিনি ত?'

'ওমা তাহলে আমরাও খুলি,' ললিতা অনিলা বলে উঠল।

'না না সেকি তোরা কেন খুলবি?' বিশাখা ব্যস্ত হয়ে উঠল। 'আমি তো পরি না, আমার জুতো নেইও। আর মন্দিরে তো জুতো পরা চলবে না।'

'তা আমরাও তো মন্দিরে যাব,' অনিলা বল্‌লে। 'তা তোমরা তখন

কিশোরদের জুতোর কাছে খুলে রেখে যেতে পারবে,' গোঁসাইজী বল্লেন, 'পরেই যাও। • বাগানে বেড়াবে তো।'

দুটী আধুনিক সভ্য মহিলা, দুটী আধুনিক তরুণ তাদের দুটী সুবেশ সন্তান—তার মাঝে বিশাখা গোবিন্দ যশোদা কেমন মানাল সেকথা কে কিভাবে ভাবল কে জানে। শুধু গোবিন্দর যেন কান মুখ লাল হয়েই রইল। তার সমস্ত উৎসাহ যেন কোথায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। মা বাক্সটা ভালো করে দেখতে পারতেন বোনটীর কি কোনো ভালো জামা নেই, ওই কি বলছিলেন মামীমা ফ্রক না কি। আর মা? মার তো কটা বারাণসী শাড়ী আছে তাওতো পরতে পারতেন। কত জায়গায় তো সেসব পরে যান মা, আর তার মাকে কত ভাল দেখায় পরলে। মামী-মাসীর কাপড় আর অত ভাল কি? গাড়ীতে বসে মার কানের কাছে মুখ রেখে গোবিন্দ বল্লে, 'মা তুমি সেই লাল কাপড়টা পরলে না কেন?' বিশাখা লাল হয়ে বল্লে, 'চুপ কর।' যশোদার মনে ওসব ভাববার অবসর ছিল না, ফ্রক পরে সে শিপ্রার পাশে বসে পরম উল্লসিত হয়েছিল হয়ত ভেবেছে সে শিপ্রার মতই সেজেছে।

আমোদে আহ্লাদে হাসি পরিহাসে একপক্ষের শিক্ষা সভ্যতার গর্বের আমেজ মেশানো কথাবার্তায় অপরপক্ষের অপ্রতিভ সৌজন্য স্বীকারে কয়েকটী দিন জলস্রোতের মত বয়ে চলে গেল।

গোঁসাইজী স্নেহমুগ্ধ প্রশ্রয়ে ললিতার গল্প শুনতেন, গল্প করতেন। ফিরে যাবার দিন ঘনিয়ে এলো।

গল্প করতে করতে সহসা ললিতা বল্লে, 'নামটা কিন্তু বদলান জামাইবাবু যশোদার। ছোট বেলায় একটা ছবি দেখেছিলাম কোন এক ক্যালেণ্ডারে। মা যশোদা গাই দুইছেন আর শ্রীকৃষ্ণ পিছন থেকে মার গলা জড়িয়ে ধরে দুধ দোয়া দেখছেন। যশোদা বল্লে ওই একটী

ছবিই মনে পড়ে যায়। অমন সুন্দর মেয়ে আর ওইটুকু বয়সে ওই নাম মোটেই মানায় না। ও যখন বড় হবে দিদির মত তখন ওর ওনাম মানাবে।'

শৈলেন বল্লে, 'তোমার দেখছি আর কিছু সংস্কারই বাকি রইল না দিদির সংসারের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টায়। ফ্রক্ পরানো থেকে নাম বদলানো অবধি।' কিন্তু গোঁসাইজী হেসে বল্লেন, 'তা আমার তো ছোট মা যশোদাই ও। তা হোক কি নাম রাখতে হবে বল তুমি, না হয় ললিতা সখীর কথাটাই থাক।'

ললিতা বল্লে, 'একটা খুব ভাল নাম আছে সেটার সঙ্গে যশোদার নামের মিলও আছে। যশোধরা রাখুন। বেশ আধুনিকও হবে।'

গোঁসাই একটু হেসে বল্লেন, 'কিন্তু তাতো আধুনিক হলনা—'

'আজ কাল যে এই রকম নাম রাখাই ধরণ হয়েছে—ওদেশে তো যাবেন না, কিছুই জানলেন না।'

'তা বটে,' গোঁসাই হাসলেন, 'কিছু দেখাই হল না কি বল গো?' বিশাখা কিছু বললেন না শুধু হাসলেন।

ললিতা বল্লে, 'কিন্তু আর এক বছর পরে খুকি তো আট বছরের হবে আমি ওকে নিয়ে গিয়ে পড়াব ইস্কুলে, কি বলিস দিদি? নইলে একেবারে হিন্দুস্থানি হয়ে যাবে, এখুনি তো বাংলা বলতে পারে না। তুই ছেড়ে থাকতে পারবি তো?'

একটু হেসে বিশাখা বল্লে, 'কিন্তু আমি ছেড়ে থাকলেই তো হবে না।'

'অর্থাৎ আমি? তা মা যশোদা একদিন তো শ্বশুর বাড়ীও যাবে। তার আগে না হয় মাসীর বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়ার অভ্যাস আমার হোক কি বলিস্ খুকি?' খুকি উৎসাহিত হয়ে বল্লে, 'হ্যাঁ বাবুজী যাব মাসীমার

বাড়ী।' গোবিন্দ যশোদার বালক চিত্তকেও আগন্তুকদের অজানা উপকরণবহুল নানা প্রয়োজন, নানা প্রকার প্রসাধন সামগ্রী, অনেক আয়োজন, অনেকখানি আকৃষ্ট করেছিল। যশোদা বুঝেছিল কি না বোঝা গেল না কিন্তু গোবিন্দ তাদের নিজেদের জীবনযাত্রার সঙ্গে ওদের অনেক প্রভেদ বুঝতে পেরেছিল। মোটকথা ওরা যে অনেক রকমে ওদের চেয়ে বড় বা উন্নত এটা শিশুমনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। হংস-শাবকের সাঁতার শিখতে হয় না। বিলাস প্রসাধন স্বাচ্ছন্দ্যের শিক্ষা অনভিজ্ঞেরও লাগে না, আপনিই মানুষ আকৃষ্ট হতে চায়। মাসীমা যে মার চেয়ে উন্নততর কেউ, মেসো ও মামা বাবার চেয়ে বেশীরকম কিছু একথা বুঝতে গোবিন্দের দেরী লাগেনি।

গোবিন্দের হাতী আছে, প্রকাণ্ড বড় মন্দির আছে, মস্তবড় বাগান আছে বটে। কিন্তু সেণ্ট, স্নো, ক্রীম, সুন্দর জুতো, ভাল জামা কাপড়—সুট, তার মার ভাল জামা শাড়ী কিছুই নেই। গোবিন্দের অত বোঝবার মত বয়স নয়, কিন্তু তারতম্য যেন বোঝা যাচ্ছিল।

গোবিন্দ বল্লে, 'বাবা আমিও যাব ওখানে পড়তে।' গোঁসাইজী বল্লেন, 'দেখ ললিতা সখী কি কাণ্ড তোমার। ছেলে নিজেই যেতে চায় যে। শেষটা আমিও না তোমার সঙ্গে যেতে চাই।' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে লাগলেন গোঁসাইজী।

একটু হেসে ললিতা বল্লে, 'চলুন না মানুষ করে দোব আপনাকে। যেন দুশো বছর আগের যুগে রয়েছেন। মন্দির ভাগবত ভজন, হাতি সগ্‌গড় দরোয়ান—যেন ঘুমের পুরী।'

ফেরবার সময় এলো। ঘুমের পুরী কিন্তু কম ভাল লাগেনি জাগ্রত দেশের লোকের চোখে। আর জাগ্রত দেশের লোকেরা যেন সহসা ঘুমের দেশের লোকদের জাগিয়ে গেল।

শান্ত নির্লিপ্ত গোঁসাইজীরও মন একটু বিক্ষিপ্ত হয়েছিল। ওদের গাড়ীর কাছে সকলে এসে দাঁড়ালেন। শৈলেন কিশোর অনিলা ললিতা একে একে গোঁসাইজী বিশাখাকে প্রণাম করে গাড়ীতে উঠ্ল।

শৈলেন বল্লে, 'আমি এসে আর বছর গোবিন্দ আর খুকিকে নিয়ে যাব।'

কিশোর বল্লে, 'আপনি এবারে যাবেন একবার জামাইবাবু।' গোঁসাইজী শুধু হাসলেন। বিশাখা গোবিন্দ ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে রইল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে তখন বাড়ী আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। কদিনের নানা কর্তব্যের ব্যস্ত সমারোহের দায় আজ আর নেই। বিশাখা অন্তঃপুরের অলিন্দে চুপকরে দাঁড়িয়ে রইল। মন্দিরে গোধূলি আরতির ঘণ্টা বেজে উঠল। শুধু কর্পূর আরতি এসময়ে। কয়েক মুহূর্তের মাঝেই আরতি শেষ হয়ে গেল। আবার পর্দা পড়ল দেবতার সুমুখে। বিশাখার আজ যেন আর কোনো কাজ নেই। মনে হয় এই পনের দিন আগেও তো অনেক কাজ করত এই সময়েই। অকস্মাৎ যেন সব দিকের কর্তব্য কি এক ক্লান্তিতে নিঃশেষ হয়ে গেছে—কি যে তার দরকার ছিল অথবা কি যে চাই এখন তা বিশাখা জানে না। অথবা ভাবে না ভাবতেও চায় না। দাসী এসে ডাক্ল। সন্ধ্যারতির প্রদীপের ঘি চাই, আর ও যেন কি কি দরকার তার জন্য পূজক গৃহিণীকে ডাকছেন।

বিশাখা নেমে গেল।

গোবিন্দ যশোদা নারায়ণ সন্ধ্যার পর একলা একলা ঘুরে, খানিক ভাইবোনে ঝগড়া করে, মার কাছে ভৎর্সিত হয়ে—অবশেষে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

অনেক রাত্রে ঠাকুরের শয়ন আরতির শেষে বিশাখা শোবার

পাশের ঘরে প্রদীপের কাছে বসে গোঁসাইজী পুরাতন অভ্যস্ত ভাবেই শ্রীধর স্বামীর গীতার টীকার হিন্দী ভাষ্য লিখছেন। এই পনের দিন তাঁর কোনো কাজ নিয়ম মত হয়নি।

বিশাখা এসে দাঁড়াল। গোঁসাইজী লেখাটা শেষ করে বালির পুঁটলী চাপা দিয়ে কালি শুকিয়ে নিতে লাগলেন। এবারে স্ত্রীর দিকে চাইলেন।

'বোসো।'

বিশাখা প্রদীপের ওপাশে বস্‌ল।

'বেশ ভাল লাগল কদিন। তোমার আজ বড় খালি লাগছে না? তা একটু লাগবে বৈ কি।'

বিশাখা প্রদীপটা উস্কে দিলে। জোর আলো হ'ল। গোসাই হাসলেন, বল্লেন, 'ওকি? একটু কম করে দাও। তোমার বোনটী কিন্তু ভারি বুদ্ধিমতী—বেশ মেয়ে।' বিশাখা প্রদীপটা কমিয়ে দিচ্ছিল, বল্লে, 'আমার বাবা বলতেন ওর বুদ্ধি সকলের চেয়ে বেশী আমাদের মধ্যে —একেবারে আলোর মত। আমি ওর মত মোটেই নয়।'

গোসাই একটু হেসে বল্লেন, 'আমার ঘরে এই আলোই ভালো। বেশী আলো কি এসব ঘরে মানায়। শৈলেন ছেলেটীও বড় ভাল কিন্তু।'

এবারে প্রদীপের সলতেটা অনেকটা তেলের মধ্যে চলে গেল। নিবে যায় আর কি।

গোসাই সবিস্ময়ে স্ত্রীর দিকে চাইলেন, 'ওকি? আমার এখনো কাজ আছে, নিবিয়ো না।'

বিশাখা বল্লে, 'নেবাচ্ছি না, উস্কেই দিচ্ছি।'

খোলা জানালা দিয়ে হেমন্তের অন্ধকার পক্ষের রাত্রির আকাশভরা তারা দেখা যাচ্ছিল। বিশাখা জানালার কাছে দাঁড়াল। বল্লে, 'তোমার

ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে না? জানালা খোলা থাকবে?' গোঁসাই অন্যমনস্ক-ভাবে বল্লেন, 'রোজই তো খোলা থাকে, না?'

'আহা এ কদিন এঘরে তুমি ছিলে না কি? এ ঘরে তো তোমার ললিতা সখীরা থাকত।' গোঁসাই হাসলেন, 'আমার ললিতা সখী? তা বটে আমি ওবরে শুচ্ছিলাম।' এবারে গোঁসাই পুঁথি পত্র মুড়ে ফেললেন, বললেন, 'আচ্ছা আজ শুয়েই পড়ি।'

পাশাপাশি ঘরে স্বামী স্ত্রী নির্বাক হয়ে শুয়ে পড়লেন, অনেক রাত্রি অবধি ঘুম আর এলো না। খোলা জানালা দিয়ে অগোচর পৃথিবীর আকাশটুকুতে তারাগুলি ঝিক্‌মিক্ করছিল, গোঁসাইজীর মনে হল যেন ললিতা সখীর ঝিকমিকে হাসি।

স্বামীপুত্রকন্যা পরিবৃত দুর্ভাবনাহীন নিশ্চিন্ত স্বাচ্ছন্দ্য ঐশ্বর্য্যময় অট্টালিকায় শুয়ে বিনিদ্র বিশাখার অগোচর মন কেবলি যেন বল্‌তে লাগল, ভালো লাগে না কিছু ভালো লাগে না। কিন্তু কি যে ভালো লাগে তাও যেন সে স্পষ্ট করে জানে না। কি ভালো লাগে না—তাও ঠিক করে বলতে পারে না।

যশোধরা

পুত্রকন্যার আগমনের অপেক্ষায় পিতামাতা ঠাকুর দালানের সম্মুখের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়েছিলেন।

কয়েক বছর কেটে গেছে—গোবিন্দ যশোধরার কলিকাতায় পড়ার জন্যে আসার পর। বৎসরান্তে ওরা গরমের বন্ধে আসে, আবার যায়।

গাড়ী এলো। ভাই বোনে গাড়ী থেকে নামল। জননীকে প্রণাম করতে নত হতে মা বল্লেন, 'ওঁকে আগে কর।' পিতা থামালেন, 'আগে রাধামোহনকে করে এসো প্রণাম।'

দুজনেই খুব বড় হয়ে গেছে—যেন চেনা যায় না। যশোধরা বিশাখার মতই সুন্দর হয়েছে। কিন্তু গোঁসাইজীর মনে হয় আরো যেন অন্য রকম, বেশী উজ্জ্বল দীপ্ত। আবার ভাবেন হয়ত বিশাখাও অমনি ছিল।

যাই হোক্ ছেলেকে পেয়ে নতুন কিছু মনে হয়নি। যতটা মা বাপের কন্যাকে নিয়ে হল। সেটা কি গর্ব্ব অথবা মুগ্ধ স্নেহ ঠিক বলা যায় না।

যশোধরা ফার্ষ্ট ক্লাসে উঠেছে, গোবিন্দ ম্যাট্রিক দিয়ে এসেছে। বিশাখা ভাবে মেয়ে পাশ করবে। গোঁসাই ভাবেন যশোধরা আর নাই বা পড়ল। কেউ কিছুই বলেন না মুখে।

দিনগুলি জলের মত বয়ে গেল। যাবার ক'দিন আগে কয়েকখানি ডাকের চিঠি নিয়ে পুলকিত মনে গোঁসাই ডাকলেন, 'তোমার মেয়ের যে বিয়ের সম্বন্ধ এলো।'

খাবার জায়গা হয়েছিল, ছেলেমেয়েরা খেতে বসেছিল, পিতাও এসে বসলেন আসনে।

বিশাখা ভ্রূকুঞ্চিত করে চাইল, প্রশ্ন করলে না কিছু।

গোঁসাই নিজের খুসীতে তার পানে না চেয়েই চিঠি তার দিকে দিলেন।

বিশাখা বল্লে, 'কার চিঠি ?'

স্মিতমুখে গোঁসাই বল্লেন, 'রাধা পিসিমার। বৃন্দাবনের বড় গোঁসাইর নাতির সঙ্গে যশোদার বিয়ের কথা বলে লিখেছেন। এবারে আর কলকাতাতে পাঠাতে বারণ করেছেন।'

বিশাখা অতর্কিতে কিছু তীক্ষ্ণ স্বরেই বলে ফেল্লেন, 'সেই গোঁসাই ঘরের মুখ্যু ছেলে তো—'

গোঁসাই একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন, তারপর বল্লেন, 'মুখ্যু কেন হবে? চিঠিটা পড় না। সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষায় পাশ করেছে, ম্যাট্রিকও দিয়েছে এবারে।'

বিশাখা সম্বরণ করতে পারেনি, উষ্ণ ভাবেই বললে, 'চিঠি আর কি পড়ব,—ও কুড়ি বছরে ম্যাট্রিক দেওয়া মুখ্যুরই সামিল।'

মেঘ-ঘন অন্ধকার রাতে ঘরের আনাচকানাচের জিনিসও যেমন সহসা বিদ্যুৎচমকে দীপ্ত হয়ে ওঠে মুহূর্ত্তের জন্য বিশাখার তীক্ষ্ণ কথার স্বরের আলোতে তার সঙ্গোপন অন্তরের অদৃশ্য কোণ কোন এক মুহূর্ত্তেই যেন গোঁসাইয়ের কাছে স্পষ্ট ফুটে উঠ্‌ল। অপ্রতিভ পিতার চোখ পড়ল ছেলেমেয়ের দিকে, তারা তাদের সুমুখে এই প্রথম জননীর তীক্ষ্ণতা অবাক হয়ে লক্ষ্য করছিল। গোসাই আর একটি কথাও বল্লেন না, মাথা নীচু করে খাবার আসনে বসলেন। গোঁসাই ঘরের মূর্খ ছেলে তিনিও তো! তিনি ম্যাট্রিক পাশও করেন নি।

বিশাখা সেই মুহূর্ত্তেই বুঝতে পারল। নিজের আকস্মিক কটু রূঢ় মন্তব্যে সব জিনিষটা বিশ্রী হয়ে গেল।

গোঁসাই নীরবেই আহার শেষ করে উঠলেন। ছেলেমেয়েরা কিম্বা জননী আর একটি কথাও বলতে পারল না কেউ।

ঐ কথাগুলি যেন একটা স্পষ্ট চিহ্নিত মন্তব্যের মত মা বাপ ছেলেমেয়ে সকলের মনেই নিজের নিজের মত ভাবে গভীর দাগ কেটে গেল।

২

কয়েকদিন পর সন্ধ্যারতি শেষের পর গোসাই ভজন শুনছিলেন, যশোধরা গোবিন্দ দুজনে এসে বসল পায়ের কাছে। সেদিনের পর সকলেরই যেন মনে হঠাৎ একটা সঙ্কোচ এসে গিয়েছিল। পিতা যেন অনেক দূরে চলে গেছেন—মনে হয়। বিশাখা আর একটা কথাও বলবার সুযোগ পাননি ঐ সম্বন্ধে নিজের রূঢ়তার কৈফিয়ৎস্বরূপ। যশোধরা বাপের কাছে সরে এসে বস্‌ল। গোসাই শান্ত স্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিছু বল্‌ছ যশোমা ?'

যশোধরা আরক্ত হয়ে বল্লে, 'না এমন কিছু না।'

ভজন শেষ হয়ে গেল, শয়ন আরতিও শেষ হল। এবারে যশোদা বলে ফেললে, 'বাবা তা'হলে আর কি পড়তে পাঠাবে না ?'

তিক্ততা রূঢ়তাতে অনভ্যস্ত গোঁসাই এক মুহূর্ত্ত চুপ করে রইলেন, একবার মনে এলো, বলেন, 'তোমার মার মত নাও।' কিন্তু তা বলতে পারলেন না। বল্লেন, 'আচ্ছা যেও এবারে।'

রাত্রে বিশাখা এটা সেটা করবার ছলে স্বামীর ঘরে এসে বসলেন। গোঁসাই গীতার টীকাভাষ্য নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। স্ত্রীকে বসতে দেখে বই মুড়ে জিজ্ঞাসু চোখে চাইলেন।

বিশাখা কিছু বলতে পারলে না। বল্লে, 'তুমি পড় না, আমি এমনিই বসে আছি।'

গোঁসাই হাসলেন। বল্লেন, 'আচ্ছা।'

গোঁসাই নিবিষ্ট মনে ভাষ্য লিখতে লাগলেন। রাত্রি গভীর হতে লাগল। বিশাখা এক একবার প্রদীপ উস্‌কে দেয়—তখন কোনো কোনো বার গোঁসাইয়ের চমক ভাঙে। এক একবার ওর পানে অপ্রতিভ ভাবে তাকান, ভাবটা কি বলবে বল আমি তো বুঝতে পারছি না।

হঠাৎ বিশাখা বল্লে, 'ওরা যে চলে যাচ্ছে—তুমি কি যশিকে মত দিয়েছ?'

গোঁসাই বল্লেন, 'হ্যাঁ যাক্। ওদের অত ইচ্ছে। ক্ষুণ্ণ হবে।'

ক্ষুণ্ণতার কথায় বিশাখা যেন স্বামীর মনের অতলের কূল পেলো। যেন কোনখান থেকে একটা করুণার মমতার রশ্মি দেখা গেল। তাড়াতাড়ি বল্লে, 'ললিতার একটী ভাসুর পো আছে—এবারে এম, এ, দেবে তার সঙ্গে যশির সম্বন্ধ করলে বেশ হয় না?' একটু থেমে আবার বল্লে, 'যশি একটা পাশ করলেই বিয়ে দেবে তারা।'

কিন্তু সেটা স্বামীর মনের কূল নয়, ছোট্ট একটু চড়া বিশাখা বলেই বুঝতে পারলে।

গোঁসাই নত মুখে কাজ করতে করতেই শান্ত সহজ ভাবে বল্লেন, 'হ্যাঁ।'

কিন্তু কবে কোথায় কি ভাবে কথা কওয়া যাবে, কি বৃত্তান্ত তাদের বাড়ীর, তারা নিজেরা কিছু বলেছে কি না, অথবা তাঁর নিজের কি মত কোনো প্রশ্ন বা মন্তব্য কিছুই করলেন না। অথবা মুখ্যু গোঁসাই ঘরের ছেলের জায়গায়, এম, এ, পাশ দিচ্ছে ললিতার ভাসুর পো পাত্র, তাঁর মনে কোনো উৎসাহ জাগালো কিনা তাও বোঝা গেল না।

ঠাকুর দালানের বাজা ঘড়িতে এগারটা বাজল। গোঁসাই পুঁথিপত্র

গুছিয়ে রাখতে লাগলেন। বিশাখা অনেকক্ষণ শুধু শুধু বসে রইল চুপ করেই। কেবল মনে হতে লাগল স্বামীর মনে প্রবেশ করবার পথ যেন সে হারিয়ে ফেলেছে।

পর বৎসর গোবিন্দ একলাই ছুটীতে বাড়ী এলো।

বিশাখা উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কইরে, যশি এলো না?'

গোবিন্দ মাকে প্রণাম করে বল্লে, 'তার শরীরটা ভাল নেই, সে বন্ধুদের সঙ্গে দার্জ্জিলিং গেছে।'

'শরীর ভাল নেই। তা এখানে তো সারতে পারত।' মা বল্লে, 'তা আমাদের লিখলেও না যে সে যাচ্ছে।'

'না এমন কিছু শরীর খারাপ নয়। তবে তার বন্ধুরা গেল মাসীমার মেয়ে শিপ্রাও গেল তাই তারও ইচ্ছে হ'ল।'

বিশাখা বল্লে, 'কাদের সঙ্গে গেল? চেনাশোনা খুব বুঝি।'

গোবিন্দ বল্লে, 'হ্যাঁ মাসীমার বাড়ী খুব যাওয়া আসা আছে। স্বাহা পালিত সংজ্ঞা পালিত দুই বোন ওর সঙ্গে এবার একসঙ্গে পরীক্ষা দিলে। তাদেরই নিজেদের বাড়ী দার্জ্জিলিংয়ে আছে, তাদের মা আর ভাই গেলেন ওদের সঙ্গেই গেল। ওদের বাবা নেই ভাই আমার চেয়ে কিছু বড় এবারে বি, এ, দিয়েছে। ওরা ব্রাহ্ম।' পিতা এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন গোবিন্দের সব কথা শুনলেন। গোবিন্দ তাঁকে প্রণাম করল।

ছেলের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে পিতা বল্লেন, 'তুমি স্নান করে নাও।'

মা অন্যমনে অন্তঃপুরে প্রবেশ করল। মনের মধ্যে কোথায় কাঁটার ফোটার মত খচ্ খচ্ করে যশোদার যাওয়াটা। তাঁদের এড়াতে চায়।

আবার জননীর মন, ভাবেন, আগ ছেলেমানুষ, নতুন দেশ দেখার সখ হয়েছে তাই গেছে। কিন্তু জানাল না কেন? একটী চিঠিও দিল না। ললিতাও লিখতে পারত। আর বেশী ভাবতে মন চায় না। কিন্তু বহু ভাবনা জাগে, শুধু কারুকে বলতে পারেন না। স্বামীর কাছে একবার বললেন। তিনি হাসলেন, বল্লেন, 'সে কি আর কিছু ভেবেছে বেড়াতে যাবার সুযোগ পেয়েছে, গেছে।'

দার্জ্জিলিংএ থাকতেই তারা পরীক্ষার ফল জানতে পারলে। যশোধরা মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়ে পাশ করেছে স্কলারশিপ পাবে কলেজেও ফ্রী হবে। কয়েকটী 'অক্ষর'ও নামের পাশে পেয়েছে সে। বিশাখার শঙ্কা সত্য, ভয়ে সে গোবিন্দের সঙ্গে যায় নি—মা বাবার কাছে। পাছে তাঁরা আর পড়তে না পাঠান এখন আর খরচের দিকে কোনো বাধাই রইল না য়া অসুবিধা অনুমতি নিয়ে।

স্বাহা পালিত বল্লে, 'ভর্ত্তি হয়ে যা, কিছু বলবেন না।'

সংজ্ঞা বল্লে, 'কি আর হবে ভেবে? নিজেরও পড়ারই তো তোর ইচ্ছে।'

যশোধরা বল্লে, 'কিন্তু বাবা ভারি দুঃখিত হবেন।'

স্বাহা একটু হাসলে, বল্লে, 'কিন্তু তাঁকে সন্তুষ্ট করতে গেলে তো সেই গোঁসাই গোবিন্দের নাতির সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবেন।'

যশোধরা লাল হয়ে একটু হাসল। জননীর তীক্ষ্ণ মন্তব্য, বাবার ক্ষুব্ধ নীরবতা আজ সে স্পষ্ট বুঝেছে। কিন্তু তাই বলে সত্যি গোঁসাই ঘরে—ঐ রকম বিয়ে। বহু আত্মীয়াদের দেখা ঘর-সংসার যা' আগে তেমন

বোঝে নি এখন সব স্পষ্ট হয়ে উঠল যেন। কলকাতার সভ্য সমাজ শিক্ষিত আবেষ্টনীর আওতার প্রভাব ক'বছরেই যথেষ্ট হয়েছিল। নিজের আত্মীয়াদের তার করুণার পাত্রী মনে হ'ত।

স্বাহাদের দাদা সুনন্দ এসে দাঁড়াল। 'আমি তোমাকে অভিনন্দন করছি যশোধরা। খুব আশ্চর্য্য করে দিয়েছো সবাইকে। সেই অত পশ্চিমের গোঁড়া বৈষ্ণববাড়ীর মেয়ে এমন করে ইংলিশে লেটার পেয়ে পাশ করেছ—আশ্চর্য্য! তারপর কি পড়বে এবারে? কোথায় ভর্ত্তি হবে?'

যশোধরা বল্লে, 'আমি তো এখনো মা বাবার মত জানি না কি করব ভাবছি।'

সুনন্দ বল্লে, 'কেন? তাঁরা মত করবেন না?'

স্বাহা বল্লে, 'না করাই সম্ভব, তাঁদের বাড়ীর ধরণে।'

'তাই বুঝি? ও, তাহলে?'

'তাহলে আর কি! ওর বিয়ে হবে বৃন্দাবনের বড় গোসাইয়ের নাতির সঙ্গে।' এবারে সংজ্ঞা মুখ টিপে হেসে বল্লে।

আরক্ত হয়ে যশোধরা বল্লে, 'থাম তোরা। বোধহয় তাঁরা পড়াটা পছন্দ করবেন না।'

সুনন্দ একটু চুপ করে থেকে ইংরেজীতে বল্লে, 'তাঁরা তাঁদের জীবন যাপন করেছেন। তোমার জীবনে তাঁদের অধিকার থাকা উচিত নয়। এটা আধুনিক যুগে অন্যায়।'

সুনন্দর মা ঘরে এসে খুব খুসী মনে যশোধরাকে বল্লেন, 'তুমি খুব আশ্চর্য্য করে দিয়েছ মা সবাইকে।'

যশোধরা একটু ইতস্ততঃ করে তাঁকে প্রণাম করলে।

তিনি কায়স্থ সে ব্রাহ্মণকন্যা তার মনে ছিল এতদিন। কোনোদিন প্রণাম বা নমস্কার করেনি।

সুনন্দর মা একটু আশ্চর্য্য হ'লেন, কিন্তু হেসে চিবুক স্পর্শ করে আশীর্ব্বাদ করলেন। বল্লেন, 'এবারে তো তোমাদের দার্জ্জিলিং থেকে নাববার সময় হ'ল। কোথায় ভর্ত্তি হবে, সব ঠিক করতে হবে। তুমি কোন কলেজে ভর্ত্তি হবে যশোধরা?'

সংজ্ঞা বল্লে, 'সংসার যাত্রার কলেজে। তুমি বুঝি জান না মা, ওর বাবা যে বিয়ের সম্বন্ধ করেই রেখেছেন।'

সুনন্দর মা যশোধরার দিকে চেয়ে দেখলেন সে অপ্রতিভ ভাবে চুপ করে রয়েছে। তখন নিজের মেয়েদের দিকে চেয়ে বল্লেন, 'তা সে তো মন্দ নয় কিছু, ভালই তো।'

স্বাহা বল্লে, 'আগে পাত্রটী কেমন শোন একেবারে তিলকমালা পরা গোঁসাই যে।'

যশোধরা আরক্তিম হয়ে উঠেছিল।

মা এবারে বল্লেন, 'তা ওঁরা গোঁসাই মানুষ ওঁদের ছেলেমেয়ের বিয়ে গোঁসাইবাড়ী হবে না তো কি তোমাদের মতন ম্লেচ্ছ বাড়ী হবে।'

স্বাহা একটু হাসলে, 'আমাদের মতন ম্লেচ্ছবাড়ীই যে গোঁসাইদের মেয়ের ভালো লাগছে, তা তুমি দেখছ না?'

অকস্মাৎ যেন সকলেই চকিত হয়ে উঠ্‌ল, কথাটী ছোট্ট কিন্তু তার ব্যঞ্জনার বিস্তৃতি আর গভীরতা যেন অনেক খানি। মাও অস্বস্তি বোধ করছিলেন। বল্লেন, 'বাজে বকিস্ নি তোরা, চুপ কর। খাবার দিয়েছে—আয়।'

পত্রদ্বারা অনুমতি আকর্ষণ করে নিয়ে যশোধরা ভর্তি হল কলেজে। গোঁড়া গোঁসাই ঘরের মেয়ের কলেজে পড়া, ব্রাহ্মবাড়ী মেশা, সকলের সঙ্গে মেলামেশা যেন হঠাৎ ভাল করে পাশ করার গুণে ললিতার কাছে বেশ গর্ব্বের বিষয় হয়ে উঠেছিল। যশোধরার লজ্জার, সঙ্কোচের, ভয়ের, পিতা-মাতার অপছন্দর ভাবনার বাধা তার গর্ব্বের ও প্রশ্রয়ের মাঝে যে কখন মিলিয়ে আসছিল তা ললিতারও চোখে পড়েনি, কিশোরেরও মনে লাগেনি। যশোধরার তো অনুভবেই আসেনি।

শুধু শৈলেন গোবিন্দের কি একটা অস্বস্তি ছিল। কিন্তু পরামর্শ করা বা আলোচনা করার সম্পর্ক বা দায়িত্ব তো তাদের নয়। যে সত্যি কর্ত্তৃপক্ষ নয়, তার সামনে বসে কেউ কোন না অবাঞ্ছিত বা অসঙ্গত কিছু করলেও যেমন তার শুধু চুপ করে দেখা ছাড়া গতি থাকে না ঠিক তেমনি ভাবে গোবিন্দ শৈলেন শঙ্কিত ঔদাসীন্যে দূরে সরে থাক্‌ত।

পরের বছরে মা বাবার সঙ্গে দেখা হল। যখন ফার্ষ্ট ইয়ার পড়া হয়েছে তখন সে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়তে বাধা পড়বে না এ জানাই ছিল যশোধরার যেন।

বাড়ীতে গোঁসাইর রাধা পিসিমা এসেছিলেন। মেয়ে দেখে একেবারে বিমুগ্ধ হয়ে গেলেন। গোসাইকে বল্লেন, 'এমন মেয়ে। একেবারে যেন কিশোরী শ্রীমতী। এ আমরা ছাড়ব না, তুই যেন আর পড়াস নি। আমি আমাদের ঘরেই নিয়ে যাব, বেশী বয়স বলে মনেও হয় না, হোক গে আঠার বছর। আহা মেয়ের কি রূপ। এ ওরা ছাড়বে না।'

গোঁসাই হাসলেন। বিশাখা চুপ করে রইলেন। সম্মুখে উপবিষ্টা নাতনীকে লক্ষ্য করে পুনশ্চ রাধা পিসিমা বল্লেন, 'আর ছেলেও খাই, এ, না কি পাশ দিয়েছে, চমৎকার গৌর গোবিন্দ চেহারা। আর কি ঐশ্বর্য্য! নাতনীর আমার কলসী থেকে জলও গড়িয়ে খেতে হবে না। চারটে করে ঝি একটা বৌয়ের জন্যে। পানের বাটাটী অবধি এগিয়ে দেয়। আর গহনাগাঁটী সে আর কি বলব। এক একটী গহনাই কত রকমের। মুক্তোর পৈঁছে হীরের বেশর মতির মালা পরে বসে থাকবি খাটের ওপর। বছরে কত গহনাই যে রাধারাণী পান শেঠেদের কাছে। সব বড় গোঁসাইয়ের এষ্টেটে জমা হয়। যত ইচ্ছে বৌরা পরে। এই সে'দিনও দক্ষিণের কোন শেঠ রাধারাণীকে দশ হাজার টাকা দামের নাকের বেশর দিয়ে গেল। বৌমা রেখে দিয়েছে, ছেলের বৌকে দেবে বলে।'

যশোধরা স্মিতমুখে সব শুনছিল পিতা মাতা কার্য্যান্তরে চলে গেলে হেসে জিজ্ঞাসা করলে, 'ঠাকুমা ওরা তাহলে সারাদিন খাটেই বসে থাকে চারটে ঝি চারপাশে নিয়ে? মাগো কি বিপদ। শুধু শুধু গহনা পরে বসে থেকে থেকে তারা পাগল হয়ে যায় না?'

ঠাকুমা বল্লেন, 'বিপদ কিসের। নড়ে বসতে হয় না—এত সুখ। বাইরে ছেলেদেরও চারটে করে চাকর তেল মাখাবে, পা টিপবে, পিকদানী এগিয়ে দেবে। তবে না এমন গজেন্দ্র আকার। তোদের মতন লেখাপড়া করে পাকাটী নয় তারা!'

যশোধরা হেসেই আকুল। গোবিন্দও ঠাকুমার গল্পের গন্ধে এসে বসেছিল। গোবিন্দ বল্লে, 'তা তুমি যে বলছ ঠাকুমা ওদের ছেলেও পাশ দিয়েছে এবারে? রোগা হয়নি পড়ে?'

ঠাকুমা ভ্রুভঙ্গি করে বল্লেন, 'রোগা হবে কি করে? তিনটে মাষ্টার আছে পড়িয়ে দিয়ে যায়। তা বড় ছেলের মতন অত ভারি

শরীর এর নয়। এইতো পেন্নথম্ এদের বাড়ী থেকে ইংরিজী স্কুলে পাশ দিলে।'

যশোধরা গোবিন্দ হেসে বল্লে, 'মাষ্টার এসে পড়িয়ে দিলেই বুঝি পড়া হয়ে যায় ঠাকুমা।'

গোবিন্দ বল্লে, 'কত বড় ছেলে ঠাকুমা? যশিও তো দুটো পাশের পড়া পড়ছে।'

ঠাকুমা বল্লেন, 'তা এই চব্বিশ বছর হবে।'

যশোধরা ফিক করে হেসে ফেল্‌লে, 'চব্বিশ বছরে আই, এ, দেবে!'

গোবিন্দ চুপ করে রইল। বিশাখা সব দূর থেকে দেখেছিলেন এবং শুনতে পাচ্ছিলেন। ডাকলেন, 'পিসিমা তোমার ঠাকুর সেবার সময় হলো। এসো এবারে, যোগাড় করে দিয়েছি।'

পিসিমা বধূমাতার কাছে শ্বশুরালয়ের ঐশ্বর্য্য সমৃদ্ধি আড়ম্বরের কাহিনী বলতে লাগলেন। তাদের বছরে কত লক্ষ টাকা আয়—কোনোরকম ব্যয় নেই। আগেকার গোঁসাইদের কারো কারো স্বভাব চরিত্রের খুব অক্ষুণ্ণ সুনাম ছিল না সেজন্যে কিছু অপব্যয় হ'ত। এখনকার ছেলেরা আর সে রকম নয়, তাতে এ ছেলের তো তুলনাই হয় না, বিদ্বান ছেলে। ওদের দোরে লক্ষ্মী বাঁধা পড়ে আছেন। সরস্বতীও এবারে এলেন। আর জানিস্ বৌমা, তোদের তো একটা হাতী, ওঁদের পাঁচটা হাতী। ওঁরা হোল বৃন্দাবনের রাজা। আর ওঁদের বংশ কি আজকের? কত কালের। যখন থেকে গোবিন্দজীর আবির্ভাব ততদিনের বংশ ধারা ওঁদের। পিসিমা কত পুরাতন গরিমার কথা বলেন।

বিমনা ভাবে বিশাখা, আগ্রহ সহকারে গোঁসাই রাধা পিসিমার প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। ঐশ্বর্য্যের কাহিনী বিশাখার একটু মনোহরণ করেনি তা নয়। গোঁসাইর কাছে অবশ্য গোস্বামীদের ঐশ্বর্য্য সমৃদ্ধি কিছু

নতুন নয়, তাঁর কাছে বৃন্দাবনের বড় গোঁসাইবাড়ী এইটেই সব চেয়ে বড় কথা। অত বড় ভক্ত পুরাতন বংশের রক্ত ধারায় তাঁর বংশ প্রবাহ মিলিত হবে। তাছাড়া মেয়ে রাজরাণীর মত ঐশ্বর্য্যশালিনী হবে। এবং ছেলে মুখ্যু নয়! তাঁর কাছে আঠারো বা চব্বিশ বছর বয়সে পাশ করা বা না করা এমন কিছু বড় কথাও নয়, লজ্জার কথাই বা কি?—গোঁসাই ও সব ভাবনা কিছুই ভাবেন না।

অতঃপর রাধা পিসিমা সকলকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ করে—বহু শুভাকাঙ্ক্ষা জানিয়ে ভাবী পৌত্রবধূরূপে যশোধরাকে বহু স্নেহ সম্ভাষণ করে বৃন্দাবনে ফিরে গেলেন। নিঃসন্তান বিধবার নিজের পিতৃকুলের রক্ত প্রবাহকে পুনশ্চ বিখ্যাত শ্বশুর কুলের বংশ স্রোতের সঙ্গে মিলিয়ে এবারে সফল করার আগ্রহের উৎকণ্ঠার শেষ ছিল না। আর এমন 'শ্রীমতী'র মত মেয়ে! তাঁর নাতনীর রূপ গর্ব্ব করে বলার মত। সেও কম কথা নয়।

বিশাখার ছেলেমেয়েও ফিরে গেল কলকাতায়। রাধা পিসিমার শ্বশুরকুলের সমৃদ্ধি ঐশ্বর্য্য যশোধরাকে কতটা মুগ্ধ করেছিল কিছুই জানা গেল না। ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ আর তা ব্যবহারের প্রকার যে সেকালের চেয়ে অনেক পরিবর্ত্তিত হয়েছে—সেটা স্পষ্ট করে না হোক অচেতন মনেই যশোধরার একটা ধারণার ভিত্তি বিস্তার করছিল। প্রচুর গহনা অলঙ্কার ভূষিত হয়ে দাসী পরিবেষ্টিত হয়ে রাত্রিদিন শুধু বিছানায় বসে থাকা পরম ঐশ্বর্য্যশালিত্বের পরিচয় বলে যশোধরার মনে হয়নি।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে গোবিন্দ আড়ষ্ট হয়ে বসেছিল। বেশী কথা নেই, দু লাইন কালো অক্ষরের সারি। কিশোরের লেখা।

বহুক্ষণ কেটে গেল। বিশাখা এসে ডাকলেন, 'কইরে গোবিন্দ নাইতে গেলি না? উনি যে খেয়ে চলে গেলেন, তোর ভাত পড়ে। আমি বলি নাইতে গেছিস। কি হয়েছে তোর? মুখটা অমন কেন? জ্বর হয়েছে নাকি?'

বিবর্ণ মুখে গোবিন্দ বলবার চেষ্টা করলে, 'কিছু হয়নি তো।' কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না শুধু চোখ দিয়ে দু ফোঁটা জল ঝরে পড়ল। সে মাথাটা নিচু করে নিলে।

বিশাখা এসে কপালে হাত রাখলেন, 'কই জ্বর তো নয়? চিঠি কার রে তোর কোলে? চিঠিটা খোলা পড়েছিল। গোবিন্দ মুখ নিচু করে বসে রইল। চিঠির সমস্ত লেখা সামান্য ক'লাইন। বিশাখা পড়লেন। কিশোরের লেখা, স্পষ্ট গোটা গোটা বাংলায় লেখা। কোনো ভনিতা নেই, দুঃখ জ্ঞাপন নেই, মন্তব্য নেই। শুধু লেখা "গোবিন্দ, কাগজে দেখলাম গত ১৭ই জুলাই সুনন্দ পালিতের সঙ্গে যশির বিয়ে হয়ে গেছে—ব্রাহ্ম বিবাহ আইন অনুসারে।"

ইতি—

বড় মামা।

ছুটীতে গোবিন্দ বাড়ী ফিরেছিল যশোধরা ফেরেনি, পরীক্ষার ফল না দেখে ফিরবে না এই বলেছিল। কথা ছিল, এবারে কিশোর বা অন্য কারুর সঙ্গে আসবে। তারপর চিঠিপত্র বহুদিন আসেনি। বিশাখা উৎকণ্ঠিত ছিলেন কেমন আছে।

বিশাখার ঘরের সামনে দেবতা দর্শনের 'ঝরোকা', জালি কাজ করা ছোট ঢাকা বারান্দা মত। হতবুদ্ধির মত বিশাখা সেইখানে বসে রইলেন।

দেবতার তখন মধ্যাহ্ন ভোগ আরতি শেষ হয়ে গেছে, দ্বিপ্রহরের বিশ্রামের জন্য পর্দ্দা পড়ল, দুয়ার বন্ধ হয়ে গেল। শ্রাবণ মাস, রেশমী ঝালর দেওয়া টানা পাখার দড়ি মন্দিরের চত্বর থেকে টানা হতে লাগল। পুরোহিত, পূজক, সেবক, দাসদাসী সকলে প্রসাদের অন্ন নিয়ে নিজের নিজের ঘরে চলে গেল। দীর্ঘ দিনের প্রহর মুহূর্ত্তগুলি কি ভাবে বয়ে যেতে লাগল বিশাখা বুঝতে পারলেন না।

অপরাহ্ণ বেলায় পূজার আয়োজনের জন্য দাসী ডাকল, পূজক আহ্বান করলেন। হতবুদ্ধি বিশাখা কিছুই বল্‌লেন না উঠলেনও না। স্বামী কোথায়, ছেলেরা কোথায়, কিছুই জানবার দরকার ছিল না তাঁর আজ। অদ্ভুত অপরিসীম লজ্জায় ধিক্কারে গ্লানিতে অভিভূত হয়ে, বিশাখা বসে রইলেন। স্বামীর কাছে এ খবর পৌঁছেচে কি না, আর তা তাঁর কাছে কি রকম বেদনাদায়ক হবে বিশাখা ভাবতেও পারলেন না। সমস্ত ঘটনাটা যেন তাঁকে কেন্দ্র করেই হয়েছে—যশোদার কলিকাতায় যাওয়া, পড়া, বিবাহ দিতে না দেওয়া,—সবই বিশাখার ইচ্ছানুসারে হয়েছে। গোঁসাই কোনো কিছুতেই বাধা দেননি।

হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বিশাখা বসে রইলেন। কর্পূরবাসিত গোধূলি আরতি, দীপধূপ বস্ত্র সর্ব্বোপচারে সন্ধ্যারতি হয়ে গেল। ভাগবত পাঠ আরম্ভ হ'ল। গোঁসাই প্রসন্নমুখে ভাগবত শুনছেন বিশাখা দেখতে পেলেন মুখ তুলে। গোবিন্দ নারায়ণ কেউই পিতার কাছে নেই। গোঁসাইর কাছে এ খবর এখনো পৌছয় নি।

রাত্রি গভীর হয়ে এলো। ছেলেরা স্বামী আহার করলেন কি না তাও জানবার ইচ্ছা হ'ল না। গোবিন্দ অভুক্ত ছিল প্রাতে একবার মনে

পড়ল। নিজেও অভুক্ত ছিলেন। কিন্তু সংসারের কাজের ভাবনা, ক্ষুধা তৃষ্ণা কর্ত্তব্যের দায়িত্ব সবই যেন গ্লানি লজ্জা শ্রান্তিতে ডুবে গেছে।

স্বামীর কাছে পরিজনদের আত্মীয়স্বজনের কাছে কি করে আর কোনোদিন দাঁড়াবেন তা বিশাখা ভাবতেও পারলেন না। সমস্ত লজ্জা ধিক্কার সবই যেন ক্লেদের মত তাঁরই গায়ে ছিটিয়ে গেছে। এইখানেই যদি এই লজ্জা ধিক্কারের জীবনের তাঁর শেষ হয়ে যেত।

শয়ন আরতি আরম্ভ হয়ে গেল। 'শ্যামকুঞ্জ, রাধাকুঞ্জ, গিরি গোবর্দ্ধন' গাইতে গাইতে মন্দির পরিক্রমা দিয়ে শয়নের বিশেষ ভজন শেষ করে পূজারী ভজনকারী সকলে মন্দির বন্ধ করে দিলেন। বিশাখা দেখতে পেলেন স্বামী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে অন্তঃপুরের দিকে চলে গেলেন। একটি প্রকাণ্ড প্রদীপ ছাড়া সমস্ত আলো ঝাড়বাতি নিবিয়ে দিয়ে গেল পরিচারকরা।

গোঁসাই আহারে বসে গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার মা আজ আসেন নি যে!'

গোবিন্দ নতমুখে বল্‌লে, 'জানি না তো।'

স্বামীপুত্রের আহারের স্থানে বিশাখার অনুপস্থিতি এমন দিন দীর্ঘকালের মধ্যে পিতাপুত্রের কারুরই মনে পড়ল না। অস্বস্তিকর নীরবতার মাঝে নারায়ণ, গোবিন্দ, গোঁসাইজী আহার সমাপ্ত করে উঠে গেলেন।

গোঁসাই নিজের ঘরে বসে গীতার টীকা ভাষ্য খুলে বসলেন। গোবিন্দ এসে দাঁড়াল। দুর্ম্মুখের কাজ তাকেই করতে হবে। মাকে সে দেখতে পেয়েছে, কিন্তু মার কাছে যেতে পারল না।

গোঁসাই আশ্চর্য্য হয়ে ছেলের দিকে চাইলেন।

গোবিন্দ আস্তে আস্তে চিঠিখানা রেখে বল্‌লে, 'একখানা চিঠি এসে-ছিল বড় মামার।' গোবিন্দ আর দাঁড়াল না।

পুঁথিপত্র সব চতুর্দ্দিকে ছড়ানো রইল। শ্রাবণের সিক্ত এলোমেলো বাতাসে প্রদীপ সারারাত্রি কেঁপে কেঁপে জ্বলতে লাগল, শয্যা যেমন তেমনি পাতা রইল, খানিক খানিক বর্ষণ খানিক আকাশ মুক্ত দেখা গেল। জানালা দিয়ে বৃষ্টির সিক্ত জলকণাও থেকে থেকে পুঁথির ছড়ানো পাতা সেঁতিয়ে দিয়ে গেল, গোঁসাই ছোট্ট চিঠিখানা সামনে নিয়ে অভিভূতের মত স্থির নিস্পন্দ হয়ে প্রহরের পর প্রহর বসে রইলেন। রাত্রি শেষ হয়ে এলো, আকাশের অন্ধকার হালকা তরল হয়ে এলো ধূসর গভীর অবগুণ্ঠনেব আড়ালে। নিঃশব্দ কান্নার মত আকাশের মেঘাচ্ছন্ন মুখ প্রত্যুষের নির্ম্মল আলোকে আড়াল করে রেখেছে।

মন্দিরের নহবৎখানায ভোরে সুর বেজে উঠ্‌ল। 'উঠরে নন্দলালা ভোর ভৈল' গান বহির্প্রাঙ্গণে দরোয়ানের মুখে শোনা গেল। গোঁসাই সচকিত হয়ে চিরাভ্যস্ত 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' 'গোপাল গদাধর' বলে উঠলেন, এবারে ঝর ঝর করে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

'হে ঠাকুর, হে জনার্দ্দন, হে গোবিন্দ, এ কী করলে,' অসম্বদ্ধ বিলাপে সমস্ত মন মথিত হতে লাগল গোঁসাইয়ের।

গোঁসাই চোখ মুছে পুঁথিপত্র গুছিয়ে তোলবার চেষ্টা করতে লাগলেন। গীতা উল্টে পড়বার চেষ্টা করতে লাগলেন, যদি কোন সান্ত্বনা পান। যদি আশ্বাসের কিছু কথা পান। কিন্তু গীতা, টীকা, হিন্দী ভাষ্য, পুঁথি, সব একাকার হয়ে গেছে ঝাপসা চোখের সামনে, সব মিশে গেছে যেন, কোনও কিছু পৃথক করা গেল না।

হতবুদ্ধি গোঁসাই হাতড়ে হাতড়ে পুঁথি উল্টাতে লাগলেন, কি দিয়ে কি করে এই চোখের জল, এই উন্মত্ত বেদনাকে চাপা যায়। ঘরে আলো

এসে পড়েছে সকালের,—তবু প্রদীপ উস্কে নিয়ে গোঁসাই গীতা খুলে পাতা ওলটান। চোখে পড়ল 'অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহম ইতি মন্যতে।' 'যন্ত্রা রূঢ়ানি মায়য়া!' চোখ ঝাপসা হয়ে গেল, আঙ্গুল দিয়ে পুঁথির উপর চিহ্ন রেখে মূঢ়ের মত গোঁসাই বার বার শুধু বলতে লাগলেন, 'অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহম্ ইতি মন্যতে।'

গোবিন্দ এসে দাঁড়াল, সারারাত্রি বিনিদ্র আরক্ত চোখে কালিমাঙ্কিত চোখের কোল পিতা বিমূঢ় ভাবে ঐ একটী শ্লোকের লাইন আবৃত্তি করছেন। পুত্রের দিকে হতবুদ্ধির মত দৃষ্টিতে চাইলেন। গোবিন্দ হেঁট হয়ে বসে বল্লে, 'আপনি উঠুন বেলা হয়েছে আমি পুঁথিপত্র গুছিয়ে দিচ্ছি।' গোঁসাইজীর সম্বিৎ ফিরে এলো। ধীরভাবে পুত্রের সঙ্গে উঠে ঘরের বাইরে এলেন। ঝরকার পাথরের জালিতে মাথা রেখে কাত হয়ে বিশাখা ঘুমিয়ে পড়েছেন। গোঁসাই সেদিকে চেয়ে স্তব্ধ ভাবে থমকে দাঁড়ালেন।

গোবিন্দ ডাকলে, 'মা ঘরে শোওনি?'

বিশাখা ত্রস্তভাবে উঠে বসলেন। আত্মবিস্মৃত স্বপ্নাভিভূতের মত বল্লেন, 'ঘরে—? আরতি দেখতে বসে ছিলাম।' সহসা সব মনে পড়ে গেল। এবারে স্বামীর মুখের পানে চেয়ে তাঁর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল। নীরবে তিনজনে নেমে গেলেন।

গোবিন্দ

গোঁসাইজীর সংসার যাত্রায় শরীরে ও অন্তরে একটা বিশ্রী কাটা ক্ষত চিহ্নের মত যশোধরার বিবাহ ঘটনাটা গভীর সুপরিস্ফুট দাগ কেটে দিলে গেল। দীর্ঘ দিন অবসাদে মূঢ়, বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে থেকে গোঁসাই ধীরে ধীরে আবার স্বাভাবিক কাজকর্ম্মের মাঝে আপনাকে নিযুক্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

গোবিন্দর এম, এ-র ফিফ্‌থ ইয়ার পড়া হয়েছিল, সে পিতামাতাকে ফেলে আর কলকাতায় ফিরে যেতে পারে নি। মনে মনে হয়ত তারও অনেক সংস্কারের 'স্কীম' কল্পনা ছিল, চিন্তার ধারাও ঠিক গোঁসাই-বাড়ীর ছেলেদের মত ছিল না, গোপন অন্তরে নানাবিধ অত্যাধুনিক, কমআধুনিক কল্পনার ধারা নানাদিকে প্রবাহিত হ'ত। কিন্তু আকস্মিক-ভাবে নিজের বাড়ীতেই এমনতর সংস্কৃতি সুরু হয়ে যাবে ঠিক বুঝতে গোবিন্দও পারেনি। সহসা এখন তার কাছে সংস্কারের অন্যদিকও স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল।

এই ঘটনার পর পিতা নিরবচ্ছিন্ন নির্ভরতায় হঠাৎ যে তাকে কেমন ভাবে আশ্রয় করে নিলেন সে তাও ভালকরে বুঝতে পারলে না। শুধু অপরিসীম সমবেদনায় ও করুণায় সে পিতার সহচর হয়ে উঠ্‌ল যেন। তিলক গান্ধি অরবিন্দের আধুনিক গীতার নানাবিধ টীকাভাষ্য, পিতাকে পড়ে অনুবাদ করে, শোনানো যেন তার কাজ হয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে নিজের পড়া ও নিজের ভাবনা যেন তার আয়ত্তের অনেক দূরে চলে গেল।

আস্তে আস্তে বৎসর শেষ হয়ে এলো প্রায়। গোঁসাই রাত্রে আর

নিজের কাজ করা ছেড়ে দিয়েছিলেন। গোবিন্দের কাছে বইয়ের নানা অনুবাদ শুনতেন ও আলোচনা করতেন। বিশাখা চুপ করে বসে শুনতেন, অথবা হয়ত সুপারি কাটতেন, শলতে পাকাতেন।

সহসা একদিন গোবিন্দ বল্লে, 'বাবা আমাদের মন্দিরের উঠানে একটা পাঠশালা করলে হয় না? আপনাদের আগে তো শুনেছি সংস্কৃত চতুষ্পাঠী মত ছিল, না? উঠে গেল কেন?'

গোঁসাই আশ্বস্ত হয়ে উঠলেন যেন পুত্রের কথায়। বিশাখাও যেন স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠলেন মনের কোণে। বহুদিন ধরে জনক-জননীর মনে ভয় ছিল, যদি গোবিন্দ কলকাতায় ফিরে যেতে চায়! যদি তারও এই দেশ, এই দেবতা-সেবা, এই দেবত্র তদারক করার কাজ ভাল না লাগে!

গোঁসাই বল্লেন, 'বেশ তো কর না। আমাদের চতুষ্পাঠী ছিল ঠাকুর্দ্দার আমলে, অনেকগুলি ব্রাহ্মণ ছাত্র থাকতেন বাড়ীতে, আমি তখন খুব ছোট অল্প অল্প মনে আছে। তারপর ঠাকুর্দ্দা মারা যাবার অল্পদিন পরেই বাবা মারা গেলেন, দেবত্র সম্পত্তি গেল মুন্সরীমের (রিসিভারের) হাতে, খরচপত্র কি হত না হত কিছুই জানি না। হয়ত দেনা ছিল, সেটা উঠে গেল। তারপর আমি বড় হলাম, তা আমি তো বেশী লেখাপড়া শিখিনি।'

গোঁসাই পুঁথির ওপর চোখ নিচু করে নিলেন। বিশাখা গোবিন্দ এতক্ষণ গোসাইয়ের দিকে চেয়েছিলেন, অপ্রতিভ বিশাখা চোখ নামিয়ে নিলেন হাতের কাছের রাশীকৃত সলিতার তুলোর ওপর। গোবিন্দের বহু দিন আগের বিশাখার মুখে গোঁসাই ঘরে যশোধরার বিবাহ নিয়ে "মুখ্যু" ছেলের কথা বলার—কথা মনে পড়ে গেল। একটু অপ্রস্তুত ভাবে চুপ করে থেকে সে বইয়ের পাতা উল্‌টাতে উল্‌টাতে বল্লে, 'আপনি সংস্কৃত তো খুব ভাল জানেন—আমরা পাঠশালা করলে আপনাকে সংস্কৃত পড়িয়ে দিতে হবে তাদের।'

গোঁসাই চুপ করে রইলেন। তারপর বল্লেন, 'কি ভাবে করবে ভেবেছ?'

গোবিন্দ বল্লে, 'আমার মনে হচ্ছিল, আপনি তো আপনার মন্দিরে দেশ-বিদেশের লোকের কাছ থেকে এত পান, এত প্রসাদ আপনার বিক্রী হয়, এতো সবই সকলের কাছে পাওয়া ; এই পাঠশালাতে সব জাতের গরীব ছেলেদের পড়াই, শুধু ব্রাহ্মণ নয় ; আর সকলকে আপনি আপনার প্রসাদের খানিকটা করে দুপুর বেলা দিন। তাতে গরীব ছেলেরা খেতেও পাবে, পড়াতেও খানিকটা মন দিতে পারবে, খাবার জন্যে আর মজুরী করতে দৌড়বে না। আর আমাদের গোঁসাই ঘরের ছেলেরা জড়ভরত হয়ে আছে, তারাও ভাল করে একটু লেখাপড়া শিখবে।' গোবিন্দ 'মুখ্যু' কথাটা উচ্চারণ করতে পারল না। গোঁসাই বল্লেন, 'বেশ তুমি কাজ আরম্ভ কর—আমি অর্দ্ধেক প্রসাদ তোমাকে দোব। কে কে পড়াবে?'

গোবিন্দ বল্লে, 'এখন আমি নারাণ আর আমাদের গোঁসাইদের জানা আর দু' একটি ছেলে মিলে আরম্ভ করব।'

২

কয়েকদিনের মধ্যেই রাধামোহনের নিস্তব্ধ প্রাঙ্গণ পল্লীর সকল ঘরের শিশু দেবতার বালগোপালের প্রতিনিধিদের কল-কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠল। সকালে আটটা থেকে এগারটা অবধি তারা পড়ে, তারপর মন্দির প্রাঙ্গণ মুখরিত ক'রে তারা প্রসাদ গ্রহণ করে বাড়ী ফেরে। দীনহীন অপ্রতিভ হাসিমুখ শিশু বালকে আঙিনা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। শুধুই পাঠশালা হলে হয়ত এত তাদের আনন্দময় মনে হত না। গোঁসাই ঠাকুর দালানে বসে, বিশাখা অন্তঃপুরের ঝরোকা থেকে এই নূতন ধরণের মহোৎসব দেখেন—তাদের পড়ার, প্রসাদ পাওয়ার। অন্য কোনো

কোনো গোঁসাই বাড়ীর কেউ, বা মন্দিরের কর্ম্মচারীরা বিরক্ত হয়, বলে, 'যত ছোট জাতের নোংরামি, অজাত-কুজাতের অপরিচ্ছন্ন কাণ্ড।'

গোবিন্দের কানে যায়, সে হাসে, 'তাহলে প্রসাদ বলেছেন কেন? মন্দিরেরই বা মাহাত্ম্য কি? ওদের যদি মন্দিরেও আলাদা রাখবেন, তা হলে কোথায় এক হবে? প্রসাদ তো ওদেরই পাওনা, ওদের মুখের হাসির দিকে একবার চেয়ে দেখুন।'

গোঁসাইয়ের কানে বাদানুবাদ আলোচনা পৌছয়, গোবিন্দের মন্তব্যও পৌছয়, তিনি কিছুই বলেন না, প্রসন্ন হাসিতে অবাক হয়ে গোবিন্দের কথাই মেনে নেন। সত্যই ওদের মুখের হাসির দিকে চেয়ে দেখেন তিনিও।

তাঁর মনে হয় অনেক কথা। মনে হয় এই দৃষ্টিভঙ্গী, এই আনন্দলোক সৃজনের কল্পনা, গোবিন্দ কোথা পেল। যে অনায়াসে সঞ্চয়ের পুরুষানুক্রমিক মোহ থেকে মুক্তি পেয়েছে, বিলাসের, ব্যসনের দুর্ব্বার বাসনাকে অতিক্রম করে গেছে, এমন লোভহীন আনন্দময় পথের কর্ম্মের প্রেরণা সে কোথা থেকে পেল।

পুরুষানুক্রমে তাঁরাও দেবতার নিত্য ও নৈমিত্তিক সেবার, ভোগরাগের ঐশ্বর্য্যময় লীলাময় উৎসব করে এসেছেন। জনসাধারণ ধনী ও দরিদ্র, অট্টালিকা-প্রাসাদ থেকে পথবাসী সকলেই তাদের পূজাসম্ভার অলঙ্কারে ধনভারে নানা উপচারে, বিনা উপচারেও এনে সেই উৎসবে যোগ দিয়ে গেছে। বিনিময়ে ওঁরাও প্রসাদ দিয়েছেন তাদের, কিন্তু নামমাত্র। বহু শতাব্দী ধরে সেই সমস্ত উপচার ধনভার দেবতার নামে তাঁর কোষাগারে জমেছে, আজো জমে আছে। আর সেই দেবতার নামে সঞ্চিত ধন সকলে কি ভাবে, কি অনাচারে, অমিতাচারে, বিলাসে, ব্যসনে ব্যয় করেছে ও করে সেও তো জানেন, দেখেছেন!

কিন্তু সে কি দেবতার ভোগ? দেবতার কাজে ব্যয় হয়েছে?

আজ গোবিন্দ বলেছে, 'সকলের কাছে ঠাকুর পান'। সত্যই তো, এতো সকলের কাছেই পাওয়া। তাঁদের আগে অবশ্য ছিল তীর্থে, দেবালয়ে, টোল, চতুষ্পাঠী, অন্নদান, অন্নসত্র ; তবু মনে হয় এ যেন অন্য ধরণের দেখা। যারা পায় না, যারা পায়নি, যারা বঞ্চিত, যারা মূঢ়, ভীত ভীরু তাদের সেই ব্রাহ্মণেতর অতি নিম্ন স্তরের সকলকেও গোবিন্দ মন্দিরের আঙিনায় এনেছে ; তাদের আসায় আজ আর প্রাঙ্গণ অশুচি হয়নি, এই কথা শ্রীচৈতন্যদেবের পর নূতন করে বলেছে। এর নামই কি চিরকালের 'সত্যের' নূতন করে প্রকাশ হওয়া ?

গোঁসাই পরম শ্রদ্ধায় স্নেহে ভাবেন, এ কোন শিক্ষা ? এতো উনি শেখাননি। এই কি আধুনিক শিক্ষা ?

অকস্মাৎ যশোধরার কথা মনে হয়, যেন তাঁর হৃৎস্পন্দন খানিকক্ষণের জন্য মূঢ় হয়ে যায়। বিচলিত হয়ে দেবতার দিকে চেয়ে থাকেন। তারপর চোখে পড়ে, দেবদেউলের গায়ে আঁকা সমুদ্র মন্থনের ছবি, লক্ষ্মী অমৃত কলস নিয়ে উঠেছেন। তারপর বাসুক র নিঃশ্বাসের বিষে সমস্ত চরাচর আচ্ছন্ন হয়ে গেল। শিব বিষের ভাগ গ্রহণ করলেন। মঙ্গল অমঙ্গলকে গ্রহণ করলেন।

৩

দিনে পাঠশালা বসে। রাত্রে মা বাপ ভাই সকলে মিলে সেই আলোচনা চলে।

গোবিন্দ বই আনায় পড়ায়, পড়ার ধারার নানারকম সংশোধন করে আলোচনা করে। খানিকটা পাঠশালা, খানিকটা স্কুল, কিছুটা মন-গড়া ধারায় ওদের পড়ানো চলে।

কাজের আনন্দে যেন মনের মরিচা-ধরা হাসিহীন আনন্দহীন জায়গা-

গুলোও মসৃণ হয়ে গেছে সকলের। বিশাখা পরম উৎসাহে প্রসাদের বিপুল ভাগ ভাণ্ডার থেকে বের করে দেন। গোঁসাই সামান্য কিছুক্ষণ বড় ছেলেদের পড়ান, তারপর স্মিত হাস্যে তাদের প্রসাদ গ্রহণ করা দেখে অন্তঃপুরে আসেন। নারাণ পরম উৎসাহে দাদার সঙ্গে অন্য বন্ধুদের সঙ্গে পড়ানোর ভার নিয়েছে।

কোন ছেলে কেমন পড়ে, কেবা দুষ্ট দুরন্ত, কেবা দীন ভয়ার্ত্ত সবই চোখে পড়ে সকলের।

গোঁসাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা ওই ছেলেটি খুব সুশ্রী দেখতে, চালাক চটপটে ভাব ওটি কার ছেলে?'

বিশাখা বল্লেন, 'হ্যাঁ বেশ ছেলেটি। নীল জরীর টুপী পরে আসে, না?'

গোবিন্দ বল্লে, 'ওটি মাধব গোঁসাইর ছোট ছেলে। বেশ বুদ্ধিমান। এরি মধ্যে অনেক এগিয়ে গেছে ওর দলের চেয়ে।'

নারাণ বল্লে, 'ওর দলের মধ্যে সব চেয়ে চালাক ওই, ওকে আলাদা করে পড়াতে হয়।'

গোঁসাই বল্লেন, 'বাঃ! তা আর সব ছাত্র তোমাদের কেমন হচ্ছে? কত মোট ছাত্র জোগাড় হল?'

গোবিন্দ বল্লে, 'তা জন চল্লিশ হবে। ছেলে প্রায় সবই ভাল, তবে যে যেমন ভাবে মানুষ হয় তার মত খানিকটা হয় তো। সেদিন একটি ছেলে, আমাদের নন্দরাম ছুতোরের ছেলে দেখলাম, কি পরিষ্কার মাথা অঙ্কে। পড়াতেও ভালো বেশ। কিন্তু বেচারা এমন ভীতু হয়ে গেছে, ভদ্রলোকের ভয়ে, উঁচু জাতের আওতায়, যে প্রশ্নের উত্তর দিলে পাছে বামুন বেনে উঁচু জাতের কাছে অপরাধ হয় সেই ভয়ে চুপ করে থাকে। একদিন সকলের অঙ্ক ভুল হল, তারই ঠিক হল তাই তাকে ধরতে পারলাম। এতদিনে তার একটু ভরসা হয়েছে কথা বলবার।'

গোঁসাই বল্লেন, 'বটে! তা ভালো তো' আর কিছু বলেন না, বসে বসে পুঁথি দেখেন।

নারায়ণ গোবিন্দ কথা কয়, বিশাখা শোনেন।

খানিকক্ষণ পুঁথি দেখে সহসা গোঁসাই গোবিন্দকে বল্লেন, 'তোমাকে একটা কথা বলব ভাবছি।'

গোবিন্দ আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসু ভাবে পিতার দিকে চাইল। বিশাখা স্বামীর দিকে চেয়ে রইলেন।

গোঁসাই আবার পুঁথির দিকে চেয়েছিলেন, এবার মুখ তুলে বল্লেন, 'তোমার তো সংসার ধর্ম্ম করার বয়স হ'ল।'

বিশাখার হাতের যাঁতি থেমে গেল। মন চঞ্চল উৎকর্ণ হয়ে উঠল। এই দীর্ঘ দিন আনন্দহীন ভবিষ্যৎ উৎসাহহীন বাড়ীতে যেন তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠতে লাগল গোবিন্দের বধূ, গোবিন্দের নির্লিপ্ত কাজের মাঝে তার আনন্দময় সংসার যাত্রা, তার সন্তান···তাদের নিয়ে তাঁদের আবার সংসার যাত্রা!

গোবিন্দ চুপ করে নিচু মুখে পিতার জন্য আনা মহাত্মা গান্ধীর গীতার ব্যাখ্যার পাতা ওলটাতে লাগল।

জনক-জননী উৎসুক হয়ে তার পানে চেয়েছিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে গোবিন্দ দ্বিধাভরে বল্লে, 'আপনি নারাণের বিয়ে দিন না বাবা।'

গোঁসাই অবাক হয়ে গেলেন, বিশাখাও আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। গোঁসাই কিছু বলার আগেই তিনি বলে ফেল্লেন, 'সে কিরে? বড় থাকতে ছোটর বিয়ে কি করে হবে?'

গোবিন্দ মাথা নিচু করে বইয়ের দিকে চেয়েছিল। গোঁসাই যেন মৌনভাবে বিশাখার প্রশ্নেরই উত্তরের অপেক্ষা করছিলেন।

এবারে গোবিন্দ বল্লে, 'বিয়েতে আমার ইচ্ছে নেই মা।' কিছুক্ষণ

ঘরটা স্তব্ধ হয়ে রইল—যেন অনেকক্ষণ। তারপর সহসা গোঁসাই বল্লেন, 'তোমারো গোঁসাই ঘরের মুখ্যু মেয়ে বিয়ে করতে ইচ্ছে নেই ?' প্রশ্নটা যেন শুধু প্রশ্ন নয়, যেন উত্তরও। বিশাখার হাতের কাজ, ছেলেদের হাতের বই, শ্রোতারা শ্রোত্রী সবই সমানভাবের জড় পদার্থের মত নিঃস্পন্দ হয়ে গেল।

খানিকক্ষণ পরে গোবিন্দ বল্লে, 'আমি শুতে যাই মা।'

৪

অবশেষে বিমনা জনক-জননী নারায়ণের বিবাহের আয়োজন করলেন। আধুনিক শিক্ষা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, মানুষের অধিকারতত্ত্ব এসব বার্ত্তা, নতুন জগতের পড়া-শোনার কথা কিছুই গোঁসাইয়ের জানা নেই, তবু কোন এক অজানা শিক্ষা, ভদ্র মন, শান্ত গাম্ভীর্য্য তাঁকে গোবিন্দর সঙ্গে বাদানুবাদ করতে প্রবৃত্তি দিল না। তিনি মাথা নিচু করে তাঁর ভাগ্যের অজানা কর্ম্মের ফল মেনে নিলেন। কিন্তু কি ভেবে নারায়ণকে আর পড়ার দিকে দিলেন না।

এইবার গোবিন্দর পড়া-শোনার কৃতিত্বে ঈর্ষাতুর এখন বুদ্ধি দৃপ্ত হয়ে আত্মীয়-স্বজনরা বন্ধু প্রতিবেশীজন জনে জনে এসে প্রকাশ্যে, ইঙ্গিতে, আভাসে বলে গেল, 'লেখাপড়া শেখার, বিদেশী শিক্ষার এই ফল; এই যশোধরার বিবাহ, এই গোবিন্দর স্বাধীন মতামত এবং এর পরিণাম মোটেই রমণীয় নয়; গোবিন্দও হয়ত কোন্ অন্য জাতের মেয়ে বিবাহ করে তোমার পবিত্র ঘরে আরো কালিমা লেপন করবে, এই তার অভিপ্রায় ইত্যাদি।'

সমবেত সংগৃহীত অভিমতের নির্গলিতার্থ এই যে, নারাণকে লেখা-পড়ার দিকে বেশী দাও নি, ভাল করেছ, ওর বিবাহ দাও।

গোঁসাই নির্ব্বাক হয়েই সব উপদেশ অভিমত গলাধঃকরণ করলেন।

উদ্ধব গোঁসাইর ছোট মেয়ে রাইকিশোরীর সঙ্গে নারাণের বিবাহ স্থির হ'ল। মেয়েটি দেখতে ভালো। সুশ্রী মুখ, আঁটসাঁট ছোট-খাটো গড়ন, গড়নের মতই কঠিন মুখ, হাসির মিত আভাসহীন টেপা ঠোঁট, ঈষৎ ধূসর তীক্ষ্ণদৃষ্টি, টানা চোখ, যে চোখ মানুষকে দেখে শুধু; যা হাসিতে মধুর হয় না, ভালবাসায় কোমল দেখায় না।

একটি পরমাত্মীয় বাদ গেল, অন্যটিও যেন সরে দাঁড়ালো; তাহলেও বহু আত্মীয়-অনাত্মীয় জড় করে ব্যথাতুর সমারোহে ক্ষুব্ধ উৎসবে নারায়ণের বধূ ঘরে এলো।

গোবিন্দ পরম উৎসাহে বধূর জিনিষপত্র সংগ্রহ করেছিল, বিশাখা গোঁসাইও বহু আশায় দীর্ঘ দিনের সঞ্চিত বহু অলঙ্কার গহনা, জরী জড়াও শাড়ী ওড়না, পিতল কাঁশা রূপার তৈজস-বাসন উজাড় করে বার করে দিলেন। আর কার জন্য? গোবিন্দ বিবাহ করবে না—যশোধরা দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্কের বাইরে।

জিনিষ-পত্র দেখে রাইকিশোরীর বুদ্ধিমতী জননী মেয়েকে বলে দিয়েছিলেন, 'মা মেলেচ্ছ বুদ্ধি ঘরে—মেয়ে পালানো ঘরে (তাঁদের মতে যশোধরার বিয়েটা পালানোরই মত) তোমায় দিলাম, শুধু এই জেনে যে সব তোমার হবে। রাধামোহনের অনেক বিষয়; এসব তোমার হল। ভাসুর যদি বিয়ে করত তো তার হত সব, বড়ইতো এখানের নিয়মে সব পায় কি না। তা ও তো বিয়ে করলে না, আর করে যদি তাহলেও আমাদের ঘরে না হলে কিছুই পাবে না। শ্বশুর শাশুড়ী গেলেই সব তোমার। সব 'উড়ন চণ্ডে' কাণ্ড ওদের; তুমি বুঝে চলবে; যা ভেবেছিলাম আছে—তার চেয়েও বেশী আছে। সব বুঝে নেবে।'

মেয়ে নির্ব্বাক মুখে সব শুন্‌ল, একটি কথাও ভুলল না। 'সব তার' একথা মনে রইল তার।

বধূ বরণ করে এনে পরম বিস্ময়ে বিশাখা দেখলেন, ওই শুষ্ক মুখ হাসিহীন তীক্ষ্ণবুদ্ধি মেয়েটির কোনোখানে যেন এতটুকু ফাঁক নেই, পথ নেই মনে প্রবেশ করবার। বসনে ভূষণে আহার্য্যে আদরে যত্নে সে ঘনিষ্ঠ হয় না; তাকে সকলের ঘরের বধূর মত সাংসারিক প্রবহমান শিষ্টাচার শেখানো যায় না, পারিবারিক পুরুষপরম্পরাগত রীতি-নীতির কথাও বলা যায় না, কিছু বললে মনে হয় সেও কি বলবে যেন, কিছু বলে না কিন্তু। তীব্র সমালোচকের দৃষ্টিতে সে শুধু নির্লিপ্তভাবে দেখে যেন।

গোঁসাই ভেবেছিলেন যশোধরার ফাঁকটা বুঝি খানিকটা পূর্ণ হবে বধূর দ্বারা—কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁরও মোহ ভাঙল। গোবিন্দ জ্যেষ্ঠাধিকারে বহু কর্ত্তৃত্ব আর বিষয়ের ব্যবস্থা করে। বহু শখের প্রয়োজনের জিনিষ আনে নারায়ণের জন্য, বধূর জন্য। বধূ কঠিন নির্লিপ্ততায় গ্রহণ করে—যেন মনে হয় সে ভাবে, সবই তো তার! যেন ওদের হাতে আনা ওরই সব এবং তা দিয়ে তারাই কৃতার্থ হয়ে যাচ্ছে, যারা দিচ্ছে।

কয়েক মাসের মধ্যেই সকলে বুঝতে পারলেন, বিশাখা গোঁসাই গোবিন্দ সবাই—হিমালয়ের যে তুষার গলে না কিম্বা গলতে আরম্ভ হয়েই আবার জমে যায় রাইকিশোরী তেমনই কঠিন আর হিম শীতল। অত্যন্ত আনন্দিত মনে সমাদর স্নেহভরে তার কাছে আসার পর সহসা পরিজনরা যেন থমকে আড়ষ্ট হয়ে যায়। তার আড়ষ্ট নির্লিপ্ততার ছোঁয়াচ লেগে যায় যেন।

তবু সকলে সত্য সত্যই একদিন কৃতার্থ হয়ে গেল।

রাইকিশোরী কি হেসেছিল? অথবা কথা কয়েছিল ভাল করে? কিম্বা তার জন্য আনা কোনো-কিছু খুশী মনে গ্রহণ করেছিল? না, সে সব কিছুই ঘটেনি। পিত্রালয় থেকে খবর এসেছিল রাইকিশোরীর একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেছে।

গোবিন্দর আনন্দের সীমা রইল না যেন। গোঁসাই বিশাখা খুশী মনে পৌত্রীকে দেখে এলেন মোহর মালা দিয়ে, রূপার বাসন দিয়ে। পৌত্রীকে কোলে নিয়ে গোঁসাইয়ের চোখ সজল হয়ে এলো, যেন শিশু যশোধরা ফিরে এলো তাঁর ঘরে।

পরম সমাদরে পৌত্রীর নামকরণ হ'ল, চন্দ্রাবলী। আর চন্দ্রাকে নিয়ে গোবিন্দর যেন নতুন পাঠশালা আরম্ভ হল আবার। কাঁথা-নেকড়া-জড়ানো চন্দ্রাকে সে দাসীর কোল থেকে নিয়ে আসে সকালে। সারা সকাল সে জ্যেষ্ঠতাত পিতামহ পিতার আশে-পাশে শুয়ে থাকে, ঘুমায়, কাঁদে, খেলা করে। মাঝে মাঝে অন্তঃপুরে মায়ের কাছে নিয়ে যায় দাসী। গোবিন্দ আবার ফিরিয়ে আনে।

সহসা একদিন কানে পৌছায় তার, 'ছোট ছেলের গায়ে অত হাত দিলে নোনা লাগে আমার মা বলেন।' অপ্রতিভ গোবিন্দ বলে দাসীকে, 'ওকে তো আমরা কোলে নিই না শুইয়েই রাখি।'

তবু চন্দ্রাবলীকে নিয়ে আসার মোহ তার যায় না।

রাইকিশোরীর পিসিমা এলেন, বৃন্দাবন থেকে। পরম গর্ব্ব ও স্নেহ সহকারে চারদিক দেখে বেড়িয়ে রাইকিশোরীর ঘরে বসলেন।

বিশাখা এসে বসলেন কাছে।

পিসিমা বল্‌লেন, 'তা এইবার আমার রাইয়ের একটি খোকা হলেই বেশ হয়। বেশ বাড়ী-ঘর আমার রাইয়ের। বেশ বিয়ে হয়েছে। তা জামাই কোথা? একবার ডাকা না?' রাইয়ের পানে চেয়েই বল্‌লেন। যেন বিশাখার উপস্থিতি তাঁর চোখে পড়েনি।

অপ্রতিভ বিশাখা নারায়ণকে অন্তঃপুরে আহ্বান করতে উঠে গেলেন।

নারায়ণ এসে প্রণাম করল। হিন্দী-মিশ্রিত বাংলায় পিসিমা আশীর্ব্বাদ করলেন জামাতাকে, 'রাজা হও, রাজা বেটার বাপ হও। যা তোমার ভাই বোন বেটা, ভাগ্যে তুমি জন্মেছিলে তাই বংশের সংসার-ধর্ম্ম নাম বজায় রইল।'

রাইকিশোরীর পানে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁরে ননদটা কোথায়?' বিশাখা দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন, নারাণকে কি জিজ্ঞাসা করবার জন্য, তাঁর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। নারাণ অপ্রস্তুত বিরক্তিভরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

তখনো শোনা গেল, 'ভাসুরটা আবার বিয়ে করবে না তো! তুই আমার রাজমাতা হয়ে—রাজরাণী হয়ে থাক।'

৬

চন্দ্রাবলীর চার বৎসরের সময় রাইকিশোরীর বেণুগোপাল জন্ম গ্রহণ করল। বংশধরের আগমনীর উৎসব চিরকালের প্রথানুযায়ী দানে অর্পণে বাদ্য ভাণ্ডে মন্দিরের প্রাঙ্গণ কলকোলাহলে ভরে দিল। পরম হর্ষে বিজয়িনীর মত রাইকিশোরীকে ও নবজাত শিশু উত্তরাধিকারীকে তার পিতা মাতা দেখে গেলেন। যেন নিশ্চিন্ত হলেন। বিশাখা ও বিশাখার

পুত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার যোগ্যতা এতদিনে রাইকিশোরী লাভ করেছে। ছেলে তো সকলেরই হয়। সব মেয়েরই—দরিদ্র ধনী সব ঘরেই। কিন্তু এতো শুধু ছেলে নয়, বংশানুক্রমিক ধনাধিকার! পৌত্রলাভে আনন্দিত বিশাখা-গোবিন্দকে যেন কি এক রকম ভাবে উপেক্ষা করে রাইকিশোরীর স্বজনরা আসে-যায়। যেন ভাবটা, বিশাখার ওরা প্রতিদ্বন্দ্বী।

তাদের উপেক্ষায় আহত ব্যাকুল বিশাখা তত বুঝতে পারেন না। কিন্তু গোবিন্দ যেন একটু বোঝে, নারায়ণও বোঝে। তবে ঈর্ষাহীন স্পৃহাহীন নির্লিপ্ত গোবিন্দের মনে হাসি আসে। নারায়ণ যেন লজ্জা পায়।

বাইরে পাঠশালার কাজ—ছোট ক্লাসের স্কুলের মত খানিকটা হয়ে উঠেছে, পড়াশোনাও বেড়ে চলেছে, ছাত্র-ছাত্রীও বেড়ে চলেছে।

গোঁসাইয়ের মনের বেদনার ক্ষত মিলিয়ে এসেছে। চন্দ্রাকে নিয়েই তাঁর পাঠশালার প্রাত্যহিক আনন্দময় আরম্ভ। বালিকা ঐ বয়সের যশোধরাকে তাঁর মনে পড়ে যায় মাঝে মাঝে, কিন্তু আর তাতে ব্যথার তীক্ষ্ণতা নেই যেন। মন ভোলাবার মায়াময় যেন যাদুময় নূতন উপকরণ সামনে এসে পড়েছে, চন্দ্রা আর বেণু রূপে।

বেণুগোপালের অন্নপ্রাশনের উৎসবের দিন এসে পড়ল। বহু সম্পর্কীয় আত্মীয়-কুটুম্বতে অন্তঃপুর ভরে গেল।

উৎসবের কদিন পর আগন্তুক আমন্ত্রিত নিমন্ত্রিতের জনতা আস্তে আস্তে বিরল হয়ে এলো।

খেতে বসে গোবিন্দ চন্দ্রাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'কদিন পড়তে যাসনি যে চন্দ্রা?'

পিতামহের পিঠের ওপর ঝুঁকে পড়ে চন্দ্রা দেখছিল, তাঁর থালার আহার্য্য থেকে কি খাবে না খাবে।

গোঁসাই বল্‌লেন, 'এসো পাশে বসো। কি খাবে? সত্যি পড়তে ভুলে গেলে বুঝি?'

চন্দ্রা বসল না, কণ্ঠবেষ্টন করে বললে, 'ভুলে যাইনি, মনে আছে।'

গোঁসাই সহাস্যে বল্‌লেন, 'কই, বলত?' চন্দ্রা বললে, 'অ এ অজগর আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাব পেড়ে,' দেখচ মনে আচে। তারপর 'লিচি (ঋষি) মছাই বছেন পূজোয়, না, দাদামশাই বছেন পূজোয়।' গোবিন্দর দিকে চেয়ে চন্দ্রা হাসে, তারই শেখানো 'দাদামশাই' বলা। সকলেই হাসলেন চন্দ্রার কথায়।

গোঁসাই বল্‌লেন; 'বাঃ বেশত মনে রেখেছ, তা যাওনি কেন পড়তে?'

চন্দ্রা দাদার পাশে বসে কি একটা তুলে মুখে দিচ্ছিল, বল্‌লে 'আল পল্‌ব না, দিদিমা বলেছে।'

গোবিন্দ ও নারায়ণ একটু আশ্চর্য্য হয়ে চাইল চন্দ্রার দিকে। গোঁসাই নতমুখে খাচ্ছিলেন, বল্‌লেন, 'কেন পড়বে না?'

চন্দ্রা ক্ষীরের বাটীর মধ্যে হাত ডুবিয়ে মুখে একটু তুলে বল্‌লে, 'মাকে বলেছে, আল পল্‌বে না, যছি পিচির মত পালিয়ে যাবে।'

বিশাখা প্রসাদের মিষ্টির আর ফলের থালা নিয়ে আসছিলেন। অতর্কিতে কথাটা কানে গেল, আস্তে আস্তে থালাখানি সেইখানেই নামিয়ে রেখে তিনি ভাঁড়ার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেম অভিভূতের মত; আর ফিরে এলেন না।

গোঁসাইয়ের হাতের গ্রাস পাতের ওপর পড়ে গেল। তিনি মাথা নীচু করে দৃষ্টিহীন চোখে থালার দিকে চেয়ে রইলেন। গোবিন্দ নারায়ণের আর মুখ তোলার শক্তি রইল না।

আকস্মিকভাবে আহত হলে কচ্ছপ যেমন তার মুখটা তার কঠিন দেহের আবরণীর মধ্যে লুকিয়ে নেয়, গোঁসাই যেন সহসা তেমনভাবেই নিজেকে

একান্তভাবে মন্দিরের পূজা-পাঠের মধ্যে লুকিয়ে ফেল্লেন। তাঁদের দীর্ঘ-দিনের লুকানো দুঃখ, সঙ্গোপন বেদনা, লজ্জা, শিশু মুখে এমন করে ধিক্কৃত হবে এমন কথা কারো মনে হয়নি, সকলে যেন সভয়ে নির্ব্বাক হয়ে গেল।

চন্দ্রার কলকাকলী কথা, হাসির অমৃতধারা পান করবার ভরসা আর নেই যেন কারো।

গোঁসাইয়ের মন্দিরের পাঠ আর শেষ হয় না, বিশাখার দেবতার ভাঁড়ারের কাজের অন্ত হয় না, গোবিন্দ পাঠশালার কাজের পর মোটা মোটা বই নিয়ে পড়তে বসে ; নারায়ণ নীরবে ভাইয়ের কাছে বসে থাকে বা কর্ম্মান্তরে নিযুক্ত থাকে—পরস্পরের কথা-আলাপও যেন আকস্মিক কি বিপর্য্যয়ে থমকে গেছে।

৭

কয়েকমাসের মধ্যেই গোঁসাইয়ের মৃত্যু হল। বাইরে ি্মনা দুই ভাই সামাজিক শোক, আনুষ্ঠানিক শোক, আন্তরিক শোক নিয়ে লোকের সঙ্গে আলাপ করে, কথা কয়, শ্রাদ্ধের আয়োজন করে। অন্তঃপুরে নিঃস্তব্ধ এক পাশে বিশাখা বহু আত্মীয়া অনাত্মীয়ার মাঝে চুপ করে বসে থাকেন। নারায়ণের শ্বশুর উদ্ধব গোঁসাই এসে বসেন। সময়োচিত খানিক 'আহা, উহুর' পর বল্লেন, 'আর বাবা, এখন সোজা হয়ে ওঠ, শোক-দুঃখ-জন্ম-মৃত্যু সবই মিথ্যে বাবা, এই সংসার এই রকমই। তিনি মহাপুরুষ ছিলেন স্বধামে গমন করেছেন। পুণ্যবান ব্যক্তি, এখন তাঁর উপযুক্ত ভাবে তোমরা সব ক্রিয়াকর্ম্ম করে বিষয় সম্পত্তি রক্ষা কর।' গোবিন্দ ও নারায়ণ চুপ করে থাকে।

তারপর আবার উদ্ধব গোঁসাই বলেন, 'তা এ দিকের কি সব ব্যবস্থা করছ?'

গোবিন্দ বল্লে, 'আপনারাই বলুন কি করা হয় না হয়?'

'তাতো বটেই, সে তো ঠিকই তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ—তা চিরকালের নিয়ম অনুসারেই সব করা উচিত। তা তোমার মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসি একবার', এবারে উদ্ধব গোঁসাই দাঁড়ালেন। অকস্মাৎ চারদিক দেখে বল্লেন,'তা বাবা পাঠশালাটি কি তুলে দিলে? বেশ করেছ! অতি অপব্যয়, বৃথা শ্রম আর ভূত-ভোজনও উঠে যাওয়াই বেশ হয়েছে।'

গোবিন্দ বল্লে, 'না তুলে তো দিই নি, অশৌচের পর আবার বসবে।'

উদ্ধব নারায়ণের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, 'না, না, না, আর নয়। তিনি প্রবীণ মানুষ ছিলেন তাঁকে বলতে পারিনি। তোমরা এ সব আর কোরো না। উঠিয়ে দাও।' যেন গোবিন্দ কেউই নয়।

নারায়ণ কি বলতে গেল, তিনি তৎক্ষণ অন্তঃপুরের দিকে চলে গেলেন। নারায়ণ লজ্জিত মুখে চুপ করে মাথা নীচু করে রইল। কয়েকজন আত্মীয়া-অনাত্মীয়াদের মাঝে বিশাখা চুপ করে বসেছিলেন, রাইকিশোরীর জননীও ছিলেন।

উদ্ধব গোস্বামী এসে বসলেন। তাঁকে দেখে কেউ কেউ উঠে গেলেন। গোস্বামী বল্‌লেন, 'আহা, কি কাণ্ড অকস্মাৎ ঘটে গেল বোঝাও গেল না। এমন সাবিত্রীতুল্যা স্ত্রীলোকের ভাগ্যে এমন ঘটনা আমরা কল্পনাই করিনি। রাইয়ের আমার পিতৃবিয়োগ হ'ল। আমি তো মিথ্যা পিতা। আপনারাই ছিলেন ওর মাতা পিতা সব। ওকে আপনাদের চরণে সমর্পণ করে যে কত নিশ্চিন্ত ছিলাম। এই দেখুন, এখন এই মহাগুরু নিপাত হল, কি-ভাবে সম্বৎসর যাবে সেও ভাবনার কথা।'

বিশাখার সম্পর্কীয়া ননদ বসেছিলেন কাছে, তিনি বল্‌লেন, ‘তাইতো।’

গোস্বামী এবারে শ্রোত্রী-হিসাবে তাঁকে পেয়ে বলতে আরম্ভ করলেন, ‘তাই নারায়ণ বাবাজীকে বলছিলাম এবার পাঠশালা ইস্কুল তুলে দাও—ওসব খরচ একেবারে বৃথা।’

ননদ বল্‌লেন, ‘ওতো নারাণ করছে না, পাঠশালা তো গোবিন্দ করেছে।’

গোস্বামী বলেন, ‘হ্যাঁ তা তো জানি। তা এখন নারাণই সব দেখবেন শুনবেন, পরে তো সবই আমার বেণুগোপালের হবে। তাঁর তো দাযিত্ব আছে একটা। কয়েকটা অপোগণ্ডের পাঠশালা করে—বিষয়টা উড়িয়ে দেওয়া তো ঠিক নয়।’

আশ্চর্য্যভাবে গোবিন্দর পিসিমা এবারে বলেন, ‘বিষয় তো এখনো নারাণের নয়—এখন গোবিন্দর; যদি বিয়ে না করে তবে নারাণের ছেলে সব পাবে।’

উদ্ধব বলেন, ‘সে তো বটেই—তবে আমি ভাল ভেবেই পরামর্শ দিচ্ছিলাম। তা বৌমা গোবিন্দকে বলবেন বুঝিয়ে তাহলেই সব ঠিক হবে।’ নত মুখ বিশাখা চুপ করেই রইলেন, গোস্বামী আর খানিকটা কথাবার্ত্তার পর উঠে গেলেন।

৮

অশৌচ গেল, শ্রাদ্ধের সমারোহ গেল। আগন্তুক জনতাও ফিরে গেল। পরামর্শদাতা উদ্ধব গোস্বামী প্রত্যহ আসেন। তার মাঝখানে ভাঙা হাটে বেচাকেনার মত পাঠশালা বসে, গোবিন্দ ছাত্রদের ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি! কতক-বা পড়তে চায়, কতক-বা প্রসাদের আশায় পড়তে আসে, অনেকে দুই-ই চায়। গোবিন্দ বিমূঢ়ভাবে বিচ্ছিন্ন আগ্রহে তাদের

নিয়ে বসে। প্রসাদ দেবার সময় হলে নারায়ণকে বলে, 'মার কাছ থেকে প্রসাদগুলো আনিয়ে ভাগ করিয়ে দে তো।'

নারায়ণ ভিতরে যায়; প্রসাদের ভাণ্ডারের চাবী যে আর জননীর কাছে নেই সে তা জানে, এবং গোবিন্দও জানে। বিশাখার শোকের মূল্যবান অবসরে সমস্ত কর্ত্রীত্ব ও চাবীর অধিকার রাইকিশোরীর হাতে গিয়েছিল। বিশাখা তখন জানেনও নি, খোঁজও রাখেন নি। তারপর? হয়ত জেনেছিলেন, সে কথা নিষ্প্রয়োজন।

তারপর থেকে নিয়মিত বিক্রীর পর উদ্বৃত্ত প্রসাদ পাঠশালায় আসে, গোবিন্দ দেখে না, জানে যা এলো অতি পরিমিত, ক্ষুধিত শিশুদের তাতে কিছুই হবে না। গোবিন্দর মনে হয় গীতার একাদশ অধ্যায়ের সেই শ্লোকের কথা—"এই রাজা মহারাজা সৈন্য কেউই বেঁচে নেই"—তেমনি গোবিন্দও বেঁচে নেই—উদ্ধব গোস্বামী ও রাইকিশোরীর কাছে,—শুধু বেণুগোপালই মাত্র জননা-সহ সেই বহুদূর পশ্চাৎপটে বিরাজ করছে।

কয়েকমাসের মধ্যেই ক্ষুধিত শিশুদের পাঠশালায় মোহ কেটে গেল। স্বল্পাবশিষ্ট ছাত্র নিয়ে গোবিন্দ বিমনাভাবে বসে থাকে। অবশেষে একদিন নারায়ন রাগ করে স্ত্রীকে বলে, 'প্রসাদ বেচে তোমার কত টাকা হয় যে তুমি দিন দিন পাঠশালার ভাগ কমিয়ে দিচ্ছ।'

রাইকিশোরী সরোষে চুপ করে থাকে। জবাব দেয় না।

নারায়ণ তিক্তভাবে বলে, 'লেখাপড়ার ধার তো ধারলে না, তাই গরীবদের অনাথদের মর্ম্মও বুঝলে না।'

এবারে বিদ্যুতের মত তীব্র হেসে রাইকিশোরী বলে, 'তোমাদের তো খুব মর্ম্ম বোঝা হয়েছে। অমন লেখাপড়া ভাগ্যিস শিখিনি।'

নারায়ণ রেগে গিয়ে মূঢ়ভাবে বলে, 'তার মানে? ও কথার মানে?' রাইকিশোরীর তীক্ষ্ণ হাসির ফলা তখনো ঠোঁট থেকে মিলিয়ে যায়নি, একটু

চুপ করে থেকে বল্লে, 'মানে দেশের সবাই জানে আর তুমি জানো না?' রাইকিশোরী আর দাঁড়াল না।

সহসা পাশের ঘরে কাঁচ ভাঙার শব্দ হ'ল। নারায়ণ বেরিয়ে এলো দালানে। পাশের ঘরে দেখলে গোবিন্দ সাবানের ফেনা-মাখা মুখে তার দাড়ি কামানোর আরসির ভাঙা কাঁচগুলো একপাশে জড় করে দিচ্ছে। আর পাশে বসে চন্দ্রা অনর্গল কথা কয়ে যাচ্ছে। অপ্রতিভ নারায়ণ এগিয়ে এলো, মনে হলো, হয়ত দাদা শুনতে পাননি। সঙ্কুচিত অন্তরাত্মা বলে দিলে, দাদা সব শুনেছেন। হয়ত সেই সময়েই আরসি ভেঙেছে অন্যমনস্কতায়।

৯

রাত্রে গোবিন্দ নারায়ণ জননীর কাছে এসে বসে।

কয়েকদিন পরে গোবিন্দ একদিন সহসাই বল্লে, 'মা আমি কলকাতায় যাব ভাবছি।'

জননী আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন, 'কেন? কলকাতায় কিছু কাজ আছে?' গোবিন্দ বলে, 'না কাজ নয়। ভাবছি এবারে গিয়ে এম, এ, পরীক্ষা দিয়ে দিই। তা হলে কাজ-কর্ম্মের একটু সুবিধা হবে।'

নারায়ণও আশ্চর্য্য হয়ে চেয়েছিল ভাইয়ের দিকে।

বিশাখা বললেন, 'কাজ কর্ম্মের সুবিধার তোর কি দরকার? এখানের সব দেখবে শুনবে কে? এ তো তোরই।'

গোবিন্দ হাসলে, বল্লে, 'পড়ে নি, পড়াটা বাকি রয়েছে। এখানের সব নারাণ দেখবে।'

'পড়া শেষ করে আসতে কতদিন হবে?' মা জিজ্ঞাসা করলেন।

গোবিন্দ বলে, 'তাকি বলা যায়, পড়ে পাশ করে যদি ভাল কাজকর্ম্ম পাই তা হলে তো ভালই হবে।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বিশাখা বলেন, 'সেকি? তা হলে ওখানেই থাকবি? এখানে থাকবি না?'

গোবিন্দ বলে, 'না না আসব বৈকি, তোমার কাছে মাঝে মাঝে।'

বিশাখা চুপ করে রইলেন। কিন্তু বিশাখার অন্তর যেন স্পষ্টই বুঝতে পারলে, গোবিন্দ সব ছেড়ে দিল। আসবে হয়ত কখনো। কিন্তু এই সংসার-যাত্রার মাঝে, এই কাজের আনন্দের কোলাহলের মাঝে আব ফিরবে না।

বিশাখা তবু বলেন, 'তা হলে পাঠশালার কি হবে?'

এবাবে গোবিন্দ নারায়ণের দিকে চেয়ে বল্লে, 'নারাণ যদি চালাতে চায়, চালাবে।'

বহু আশা কল্পনায় গড়া, গোঁসাই-বিশাখার মনে বহু সান্ত্বনা আনা, গোবিন্দর আনন্দময় নিজস্ব কর্ম্মের কল্পনার লোক বাস্তবের লোভের চাকার তলায় গুঁড়িয়ে চুরমার হয়ে গেছে। কিন্তু গোবিন্দরও মন তার মোহমুক্ত হয়ে গেছে একেবারে।

নারায়ণ চোখ নীচু করে রইল। কাজের সঙ্গে দৃষ্টির প্রসারতা যেটুকু হয়েছিল সেটা ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। যে অধিকার তার ছিল না, হতে পারত না,—একেবারে অপ্রত্যাশিত, পাছে বিচ্যুত হয় তা থেকে—তাকে আয়ত্ত করবার রাইকিশোরীর ও তার মা বাপের বিপুল চেষ্টার ছোঁয়াচ ক্রমশঃ তাকেও লাগছিল। যশোধরাকে ধিক্কার, গোবিন্দকে অকারণ অনাবশ্যক অস্তিত্ব মনে করা ভাল না লাগলেও প্রতিবাদ করবার মত মানসিক শক্তি নারায়ণের ছিল না।

ছেলেরা উঠে গেল। বিশাখা উন্মনাভাবে চুপ করে বসে রইলেন,

হয়ত স্পষ্টভাবে তিনি জানেনও না, বুঝতেও পারেননি যে তাঁর অগোচর মনের অতল মন্থন করে তাঁর অতি প্রিয় যারা দুজন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে দাঁড়াল তারা তাঁর সংসারে বিষ আর অমৃত দুইই এনেছিল। বিষ তাঁর সমস্ত জীবনের ধারা নীল বিবর্ণ করে দিয়ে গেছে, আর আনন্দের অমৃতধারা লোভের মরুভূমির মাঝে পথ হারিয়ে ফেলল।

নারায়ণের পুত্র-কন্যা নিয়ে—পৌত্র-পৌত্রী পরিবেষ্টিত সংসার যাত্রা তাঁর রইল বটে, কিন্তু কোনো বন্ধনই যেন রইল না। নারায়ণ তাঁর সন্তান, কিন্তু গোবিন্দ যেন তাঁর শুধু সন্তান নয়; সম্পদ, নির্ভর, আশ্রয়।

গোবিন্দ নারায়ণ আহারান্তে শোবার জন্য উপরে এলো। নারায়ণ শুতে চলে গেল। গোবিন্দ জননীর কাছে দু'চারটি কথা বলে আপনার পড়া-শোনা নিয়ে বসল। মন্দিরের সব আলো নিবে গেল, দাস-দাসীরা শয়ন করতে গেল। বিশাখার মালা জপ আর শেষ হ'ল না। তিনি চুপ করে অন্ধকার প্রাঙ্গণের দিকে চেয়ে রইলেন, যেখানে পাঠশালা এখনও বসে, যে পাঠশালা তাঁদের অবসন্ন মনে নতুন লোকের বার্ত্তার, আশার, আনন্দের সন্ধান এনে দিয়েছিল, গোবিন্দর সুখে-দুঃখে মোহে-মমতায় যে পাঠশালা গড়ে উঠেছিল, কোন্ দেশের কোন্ কালের অনাগত দিনের আদর্শে অথবা কি অপরূপ আশায় তা তিনি জানেন না; শুধু আজ যখন ভেঙে যাচ্ছে সেই আনন্দময় পাঠশালা, সেই খেলাঘর শিক্ষালয়,—তখন তাঁর মনে হ'ল, এই মানুষের মনের অনির্ব্বচনীয় ধ্রুবলোকের সন্ধান আর কোনোদিন তিনি পাবেন না। এ কোন্ সত্য তা বিশাখা জানেননি, কিন্তু সন্তানের চোখ দিয়ে সেই অপূর্ব্ব দৃষ্টিশক্তি তিনি লাভ করছিলেন।

বিশাখা নিঃশব্দে বসে রইলেন। নিজের গড়া ঘর-করনার সামনে যেন আজ সহসা তাঁর নিজেকে দর্শক মনে হতে লাগল।

বালীগঞ্জের একটি বাড়ীর সামনে গোবিন্দ এসে দাঁড়াল। কড়া নাড়তে একটি চাকর এসে দরজা খুলে দিলে।

গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করলে, 'বাড়ীতে কে আছে?' ভৃত্য বল্লে, 'মা আছেন। আপনি বসুন।'

বাইরের বসবার ঘরে গোবিন্দ এসে বসল। আধুনিক ধরণের বসবার ঘর ; যেমন টেবিল চেয়ার-কোচে সাজানো হয়। জানালা দিয়ে প্রচুর রৌদ্র বাতাস আসে, জানালায় দরজায় সুশ্রী পর্দ্দা ফেলা। ছবি মূর্ত্তি দামী বইতে ঘর সজ্জিত।

গোবিন্দর চোখে কিছু হয়ত পড়ল, হয়ত পড়ল না, জানা গেল না।

সহসা ভিতর দিকের পর্দ্দা সরিয়ে যশোধরা এলো।—'দাদা?' সবিস্ময়ে যশোধরা থমকে দাঁড়াল, তারপর নত হয়ে প্রণাম করলে।

তাকে দেখে গোবিন্দর দীর্ঘকাল আগের জননীর কথা মনে পড়ল যেন।

গোবিন্দ তার মাথায় হাত দিয়ে বল্লে, 'ভাল আছিস্, সুনন্দ ভাল আছে?'

যশোধরা ঘাড় নাড়লে। ভাই-বোনের পুরাতন কথার উৎস যেন শুকিয়ে গেছে।

গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করলে, 'সুনন্দ কোথায়? কখন আসে?' যশোধরা বল্লে, 'কোর্টে গেছেন। সন্ধ্যের পর ফেরেন ক্লাব থেকে।'—'তোর কি একটা বাচ্চা আছে না? তাকে আন্?'- যশোধরা ছেলেকে নিয়ে এলো।

পরম সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট শিশু বছর তিনেকের।

কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই মাতুলের সঙ্গে তার ভাব হয়ে গেল।

'কি নাম রেখেছিস রে? কে আছে এখানে? তোর শাশুড়ী কোথায়—আর ননদ?'

যশোধরা বল্লে, 'শাশুড়ী এখানে থাকেন না। নাম ওর এখনো কিছু হয়নি, তুমি বলনা একটা। তুমি হঠাৎ এলে যে দাদা?'

'নাম তোরাই রাখ্, তোরা কত জানিস নাম। কিন্তু তিনি কোথায় থাকেন তাহলে তোর শাশুড়ী? আমি এম, এ, পরীক্ষা দেবো মনে করে এলাম।'

শাশুড়ীর কথায় যশোধরা অপ্রস্তুত হয়ে বল্লে, 'তিনি আলাদা থাকেন। আমাদের বিয়েতে তাঁর মত ছিল না, তাঁর ব্রাহ্ম ঘরের মেয়েতে ইচ্ছে ছিল। তাহলে তুমি পড়বে? বাবা মত করলেন?'

গোবিন্দ ভাগিনেয়কে নিয়ে খেলা দিচ্ছিল। কিছু বল্লে না।

এবারে সহসা যশোধরা বল্লে, 'দাদা, বাবা কেমন আছেন?'

এবারে গোবিন্দ এক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে বল্‌লে, 'বাবা নেই।'

যশোধরা আস্তে আস্তে মাথাটি চেয়ারের হাতলের ওপর নীচু করে নিলে। তার চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে জল পড়তে লাগল।

গোবিন্দ নীরবে জানালার বাইরে চেয়ে রইল। সান্ত্বনার কথা, শোকের কথা, সমবেদনার কথা কিছুই সে বলতে পারল না। অনেকক্ষণ পরে যশোধরা মুখ তুলল। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, 'দাদা, বাবা আমার কথা কি বল্‌লেন?'

গোবিন্দ একটু থেমে বল্লে, 'তিনি তো কোনদিনই বেশী কথা বলতেন না। কিছুই বলেননি।'

সে যশোধরার ছেলেকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল, বল্‌লে, 'আজকে যাইরে, আবার একদিন সুনন্দর সঙ্গে দেখা করতে আসব।'

দরজার কাছে খোকাকে কোল থেকে নামিয়ে গোবিন্দ রাস্তায় নেমে গেল।

যশোধরা উন্মন দৃষ্টিতে পথের দিকে চেয়ে রইল। জনক-জননী, গোবিন্দ-নারায়ণ সমস্ত সম্পর্ক সমস্ত অতীত যেন তার চোখের সামনে মুছে দিয়েছে কে। যেন সেদিকে কোনো পথ নেই—কোন ক্রমেই আর কোনোদিন সেই পথে যাওয়া যাবে না। সে জননীর কথা, নারায়ণের কথা জিজ্ঞাসাও করতে পারল না—সে নিজের অতীতের কাছে যেন মৃত।

অনেক দূর গিয়ে সহসা পিছন ফিরে গোবিন্দ দেখল একবার—যশোধরা তেমনি চুপ করে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

নারায়ণ, বেণু ও চন্দ্রা

দীর্ঘ কুড়ি বছর কেটে গেছে। নারায়ণ এখন প্রৌঢ়ত্ব পার হয়ে গেছেন, বেণুগোপালের কোনো ভাগীদার নেই। চন্দ্রাবলীর বিয়ে হয়ে গেছে। রাইকিশোরী নিশ্চিন্ত। বেণুগোপালের বিয়ের কথা হচ্ছে। তা'হলেই সব হয়।

দ্বিপ্রহরে বাইরের আঙিনায় বুড়ো দ্বারবানের ঘরে এখনো, 'রামচরিত-মানস' পড়া হয় তেমনি। বৈকালিক সিদ্ধি ঘোঁটা হতে থাকে। তার সঙ্গে প্রাঙ্গণে প্রকাণ্ড একটা শিলে বাটা হতে থাকে 'ঠাণ্ডাই' (বাদাম, পেস্তা, খরমুজের বিচি) দুধ দিয়ে, সিদ্ধিতে মিশিয়ে বেণুগোপাল কুস্তির শেষে সবান্ধবে খাবে।

গরমে জল ছিটোনো খসখসের টাটি দেওয়া ঘরে ঘুম, শরতে তাস পাশা খেলা, শীতে ঘুড়ি ওড়ানো ছাতে, কিম্বা খোস গল্প রৌদ্রে বসে, আবার বসন্তেও তাস পাশা। বছরের পর বছর একইভাবে ঘুরে যায়। মন্দির যত দিনের ভাবধারাও যেন তত দিনেরই, একইভাবে চলেছে। আয় ব্যয় আহার বিলাস সবই পুরাতন প্রথায়। শুধু মাঝে কয়েক বছর মাত্র গোবিন্দের সময়ে অন্য রকম কিছু হয়েছিল।

পিয়ন এসে ডাকল,' রেজেষ্ট্রী আছে দুটো। সই করে নিতে হবে। রামচরিত ছেড়ে স্থবির দ্বারোয়ান উঠ্‌ল। চিঠি? কার নামে? বেণু-গোপাল গোসাই আর চন্দ্রা গোঁসাই? সই করে নিতে হবে। ঘুড়ি ছেড়ে বেণুগোপাল সবান্ধবে নেমে এলো।

নারায়ণের কাছে খবর গেল। রেজেষ্ট্রী চিঠি বেণু চন্দ্রার নামে? কে পাঠাল? সই করা হল।

চিঠি এসেছে এক এটর্নীর আপিস থেকে কলকাতা থেকে।

বেণু ও চন্দ্রাকে পৃথক চিঠিতে একই কথা লেখা, গোবিন্দ গোস্বামীর উইলের নির্দ্দেশ অনুসারে তাঁর লাইফ ইন্‌সিওরের দশ হাজার টাকা শ্রীযুক্ত বেণুগোপাল গোস্বামী আর চন্দ্রাবলী দেবীকে দেওয়া যাবে পাঁচ হাজার করে। সে বিষয়ে এটর্নীর আপিসে খোঁজ করলেই সব খবর জানানো হবে।

বেণুগোপালের কষ্ট করে লেখা পড়া শেখবার কিছু দরকার নেই, তাকে তার বন্ধু বান্ধব স্তাবকরা বুঝিয়ে ছিল। কষ্টে স্বষ্টে বাপের সাহায্যে তখনকার মত পাঠোদ্ধার হ'ল চিঠির।

নারায়ণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। উইল? দাদার উইল? তাহলে দাদা নেই? স্থবির বিশাখা এখনো বেঁচে আছেন। যশোধরার চলে যাওয়া—স্বামীর মৃত্যু তাঁকে কষ্ট দিয়েছিল মর্ম্মান্তিক। গোবিন্দর চলে যাওয়ার পর ও তাঁর শান্ত সংযম ও ধৈর্য্য নষ্ট হয়নি।

আগে দু' তিনবার বহু পরে পরে দু' একদিনের জন্যই গোবিন্দ এসেছে মাকে দেখতে দেখা করতে। শেষ দিকে কয়েক বৎসর সে আর আসে নি, যেন মনে হত সে এলে রাইকিশোরী ও নারায়ণ বিচলিত হয়ে উঠ্‌তেন। চিঠিপত্র দিত জননীকে। নিয়মমত জননীর নামে মাসের পর মাস টাকাও এসেছে। কিন্তু বছর দুইয়ের বেশী হবে জননী আর যেন তেমন প্রকৃতিস্থ নেই, কানেও কম শোনেন, বোঝেনও কম।

নারায়ণের চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। ভাইয়ের কথা মনে পড়ে। মার সঙ্গে বসে একসঙ্গে গল্প করা—পিতার কাছে বসে কত রকম আলোচনা সব মনে পড়ে। তারপর? তারপর কি রকম অদ্ভুতভাবে সমস্ত

ঘটনা মোড়ের পর মোড় নিল। যশোধরা গিয়েছিল সে আঘাত মা বাবার মনে কম লাগেনি। কিন্তু গোবিন্দের যাওয়ার কি দরকার ছিল?…… কেন গেল? স্পষ্ট কারণ ঘটেনি কিন্তু নিগূঢ় মর্ম্মান্তিক দুঃখময় সঙ্কোচে নারায়ণ যেন নিজের মনের কাছেও লুকিয়ে লুকিয়ে ভাবেন সেদিনের কথা…! দীর্ঘ সুন্দর দেহ দীপ্ত হাসি মুখ দাদা কিছু না বলেই কারুকে কোনো অভিযোগ অনুযোগ না করেই পড়ার নাম করে চলে গেল, নিজের সম্পত্তিরই সমস্ত অধিকার ওকে ছেড়ে দিয়ে। তার নিজের দুর্ব্বলতা রাই-কিশোরী ও তার বাপের প্রচণ্ড লোভ যেন দাদাকে নিরুপায় হয়ে—ঘর ছাড়া করল। কিন্তু দাদা কেন জোর করল না? মা কেন বল্লেন না? দাদা বিয়ে করুক বা না করুক দাদার অধিকার সে কেন ছেড়ে চলে গেল? নারায়ণ আজো বুঝতে পারেন না সে কথা। গোবিন্দ চলে যাওয়াতে রাইকিশোরী খুসীই হয়েছিল। তার পিত্রালয়ের লোকেরা নিশ্চিন্ত হয়েছিল। কিন্তু তিনি কেন আশ্বস্ত হয়েছিলেন?……নিজের ওপর এতদিন পরে যেন কেমন বিতৃষ্ণা হয়, ধিক্কার আসে। অবুঝের মত প্রতিকার খুঁজে বেড়াতে চায় মন! কোনোদিনই বেশী খুঁটিয়ে ভাববার ক্ষমতা তাঁর ছিল না, কিন্তু বেদনাবোধও ছিল না। আজ এক অদ্ভুত ব্যাকুল দুঃখ তাঁর অন্তর মথিত করে তুলতে থাকে।

সহসা স্তব্ধ হয়ে মনে হ'ল, এই প্রথম সর্ব্ব পরামর্শদাত্রী রাইকিশোরীকে এই বিষয়ে তাঁর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করার বা বলার ইচ্ছা নেই! বেণু-গোপালের কাছেও বিশেষ কিছু বলতে পারলেন না। তাঁর এই শৈশবের বাল্যের যৌবনের সঙ্গী সাথীকে ওরা কেউ জানে না চেনে নি। কিন্তু শুধু কি ওরা? তিনিও কি চিনেছিলেন? ভোগাসক্ত লুব্ধ দীর্ঘ জীবন কাটিয়ে সহসা আজ নিরাসক্ত গোবিন্দর কাছে বিশাখার কাছে নিজেকে অপরাধী মনে হ'ল।

২

মাধব গোঁসাইয়ের ছেলে কৃষ্ণপদর সঙ্গে চন্দ্রাবলীর বিবাহ হয়েছিল। তারা এলো।

নারায়ণ জামাতার হাতে চিঠি দুখানা দিলেন।

চিঠি পড়া হলে সে রেখে দিলে। গোবিন্দকে সে দেখেছিল, তাঁর পাঠশালায় সেও ছাত্র ছিল। তার তাঁকে মনে আছে।

কিন্তু চিঠির এই খবর—এই পরিবারের কাছে,—তার কাছে, মৃত্যুর জন্য শোকের বা টাকার জন্য আনন্দের তা বোঝা গেল না। সে চুপ করে বসে রইল। ছোট সহরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কীয় জাতি ও পরিবারের সব পারিবারিক বড় বড় ঘটনাই প্রায় সকলের জানা হয়ে যায়। কৃষ্ণপদরও অনেক কথাই জানা ছিল যশোধরার কথা, গোবিন্দর বিবাহ না করার কথা, তারপর গোবিন্দর চলে যাওয়া।

বেণু চুপ করেই বসেছিল, তার জ্যেঠাকে জানাই ছিল না। চন্দ্রাও নীরবে বসেছিল। সে যখন ছোট ছিল, তখনকার কথা পিতামহীর কাছে প্রতিবেশিদের কাছে শুনেছে।

আস্তে আস্তে পিতাকে সে বল্লে, 'তাহলে কি জ্যেঠামশাই বেঁচে নেই?'

নারায়ণ জামাতার দিকে চাইলেন। চিঠির অর্থ সে ভাল করে করতে পারবে। সে লেখাপড়া শিখেছে, পাশ করেছে, স্কুলে মাষ্টারী করে।

জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কি মনে হয়?'

সে বল্লে, 'আপনারা ওদের আপিসে চিঠি লিখুন। নেইই মনে হয়, নইলে তারা টাকার কথা লিখবে কেন?—আর কোনো চিঠি-পত্র কেউ লেখেনি?'

বেণুগোপাল জবাব দিলে, 'কে লিখবে?—সেখানে আর তাঁর কে আছে।'

চন্দ্রাবলী বল্লে, 'কেন পিসিমা তো আছেন।'

রাইকিশোরী এসে দাঁড়ালেন, 'কার পিসিমা?'

বেণুগোপাল বল্লে, 'আমাদের পিসিমা।'

রাইকিশোরী জিজ্ঞাসুভাবে সকলের দিকে চাইলেন, তারপর বল্লেন, 'এতদিন পরে তাঁর নামে কি দরকার?'

আশ্চর্য্য, আজ আর বেণুগোপাল ভয় পেল না। নারায়ণও কিছু বল্লেন না। রাইকিশোবীর কথার জবাবে বেণুগোপাল শুধু বল্লে, দরকাব একটু আছে। জ্যেঠার উপর মমতা বোধ না থাক, আজকের এই চিঠি তাঁর চলে যাওয়ার ইতিহাস তার কাছে অস্পষ্টভাবে কি ফুটিযে তুলেছিল যেন।

নারায়ণ ছেলের দিকে চেয়ে তারপর স্ত্রীর পানে চেয়ে শান্ত ভাবে বল্লেন, 'দাদার এটর্ণীর চিঠি এসেছে বেণু আর চন্দ্রাকে দাদা কিছু টাকা দিয়ে গেছেন।'

'গেছেন' কথাটা মানেই যেন যে দিয়েছে সে নেই।

রাইকিশোরী আশ্চর্য্য ভাবে চুপ করে গেলেন কিছুক্ষণের জন্য। তারপর বল্লেন, 'তিনি তাহলে মারা'ই' গেছেন?'

শোক নয়, শোচনা নয়,—বেদনাবোধ নয়। শুধু হয়ত তাঁর মনে হ'ল লৌকিক কাজ, দায়, নিয়ম; হয়ত একেবারে নিশ্চিন্ত হলেন বিষয় সম্পত্তি সম্বন্ধে।

নারায়ণ ও বেণু সকলেই তাঁর দিকে চাইল, 'মারা গেছেন' কথাটা শুনে। নারায়ণ বল্লেন, 'ঠিক জানি না এখনো। মাকে জানাবার দরকার নেই।'

কৃষ্ণপদর পানে চেয়ে বল্লেন, 'তাহলে কি করা যায় ?'

সে বল্লে, 'আপিসে লেখা হলে সব জবাবই পাওয়া যাবে।'

রাইকিশোরী অবাক হয়ে নির্ব্বোধের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর চির অনুগত স্বামী সন্তান আজ তাঁকে এবং তাঁর পরামর্শ ছাড়াই কাজ করছে !

চন্দ্রাবলী উঠে আসে পিতার ঘর থেকে। একবার দাঁড়ায় পিতামহীর কাছে গিয়ে। অদ্ভুত অব্যক্ত বেদনা তার গলার কাছে বাসা বেঁধে নেয়। যে দুঃখের ভাষা নেই, বিলাপ নেই, আলোচনা নেই। সবচেয়ে বড় দুঃখ এই একান্ত আপনার জন, সত্যিই মহৎ লোক, তাকে জানা হয় নি, চেনা হয় নি, কেউ তার কথা বলে নি। পিতামহীর মুখেই বা সেই তাঁর কথা তারা কি বা শুনেছে !

বিশাখা বুদ্ধিহীন স্মৃতিহীন লোকের মত প্রসন্ন স্মিত মুখে ওর দিকে চাইলেন, যেন ও কি বল্‌চে জানতে চাইলেন, আর তিনিও যেন সব বুঝতে পারবেন !

চন্দ্রার এবারে চোখে জল এলো। মনেহয়—লোকমুখে গল্পে শোনা, পিতামহীর রূপের কথা, বুদ্ধির কথা, যশোধরার কথা, গোবিন্দর কথা। না, সাধারণ সকলের মত ওরা—মা বাবার কাছে কোনো পুরানো স্মৃতির মধুর কাহিনী পারিবারিক কথা শোনেনি। ওরা শুধু শুনেছিল তাদের পিসিমার অসামাজিক বিয়ের কথা, পড়াশোনার কথা। যার জন্য বিশেষ ভাবেই তাকে লেখাপড়া শিখতে বাধা দিয়েছিলেন জননী।

রাত্রে শ্বশুর বাড়ী ফিরে আসে সে উন্মনাভাবে। ব্যক্তিগত শোক নয়, জানা লোকের কথা নয়, অথচ স্বামী স্ত্রী দুজনে ভাবে একই কথা। কেমন ছিলেন তিনি ? কেন গেলেন ? তাঁকে আঘাত করেছিল কেউ ? না এমনি ? তবে আর ফিরে আসেন নি কেন ? তাঁর জননীও তাঁর

কথা কেন বলতেন না? তিনিও কি বিয়ে করেছিলেন যশোধরার মত? তাহলে এ টাকা তো দিতেন না তারাই পেত!

সসঙ্কোচে চন্দ্রা কৃষ্ণপদকে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার মনে আছে তাঁর কথা—এই জ্যেঠামশাইয়ের কথা?' তার জ্যেঠামশাইয়ের কথা সে জিজ্ঞাসা করছে অন্য লোককে! কৃষ্ণপদ বুঝতে পারে যেন তার মনের কথা। বলে, 'একটু একটু মনে পড়ে। স্পষ্ট নয়—। আমরা খুব ভাল বাসতাম পাঠশালায় যেতে। অনেক ছেলেই প্রসাদ খেতে পাবার জন্যেই যেত। আমাদেরও বেশ লাগত।'

তারপর চুপ করে যায়। আরো অনেক কথা জানে, বড় হয়ে জেনেছে, চন্দ্রার সঙ্গে বিয়ে হবার আগে ও পরে। সেকথা রাই কিশোরীর ক্ষুদ্রতার নারায়ণের দুর্ব্বলতার কথা,—সেকথা বলা যায় না চন্দ্রাকে।

'কিন্তু পাঠশালা তো আমরা দেখিনি?'

'না, উঠে গিয়েছিল।'

'জ্যেঠামশাই উঠিয়ে দিয়েছিলেন?'

কৃষ্ণপদ বলে, 'ঠিক জানি না আমরা তখন ছোট।'

৩

জবাব এলো চিঠির এটর্ণীর অপিস থেকে।

কৃষ্ণপদ চিঠি পড়ে খবর বলে শ্বশুরকে।

মৃত্যু তাঁর হয়েছে। এবং অশৌচ শ্রাদ্ধের দিনও কেটে গেছে। তাহলে কোনো দায় কর্ত্তব্যও নেই! নারায়ণ দুঃখিত ভাবে চুপ করে থাকেন।

বেণু গোপাল বলে, 'কিন্তু আমাদের তো কিছু করা উচিত বাবা?'

নারায়ণ আশ্চর্য্য হয়ে চান তার দিকে। সে বলে, 'দিদি বলছিল সেদিন, আমরাই তো তাঁর ছেলেমেয়ের মত, তা আমরা কিছু করব না ?'

নারায়ণ বল্লেন, 'বেশ। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি যা বলেন তাই হবে।'

আন্তরিক ও পরম শ্রদ্ধা সহকারে উত্তীর্ণ দিন শ্রাদ্ধের দিন দেখা হয়। নিয়ম সামগ্রী যোগাড় করা হয়।

রাত্রে বসে বাপের সঙ্গে বসে কথা কয় পরামর্শ করে ছেলেমেয়েরা। শোচনাময় বেদনায় তিনজন এক জায়গায় বসেন। হঠাৎ চন্দ্রা জিজ্ঞাসা করে, জ্যেঠামশাইয়ের পাঠশালা উঠে গেল কেন বাবা ?' অতর্কিত আঘাত পেলে যেমন মানুষ কেমন যেন হয়ে ওঠে তেমনি নারায়ণের মুখটা ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ল।

বেণুগোপাল বল্লে, 'আমার বন্ধুরাও ঐ কথা সেদিন বলছিল। তাদের কেউ কেউ ঐ পাঠশালায় পড়েছিল। কেন তুলে দিলে বাবা ?'

সত্য কথা যদি সত্য করেই বলা যেত ! কারুর দোষ না দিয়ে, কারুকে না বাঁচিয়ে নিজের দুর্ব্বলতা দেখিয়ে ! নারায়ণ বল্লেন, 'কি জানি, তখন বুঝতে পারলাম না। বাবা মারা যেতে তোমাদের মাতামহ এসে বারণ করলেন, বল্লেন অপব্যয় হচ্ছে বড়।'

বেণু চন্দ্রা একসঙ্গে বল্লে, 'তোমাদের বাড়ী অত ভাল কাজ দাদামশাই বারণ করলেন ! তোমরা শুনলে কেন !' যুগধর্ম্মে তাদেরও মনে শিক্ষা অশিক্ষার ভালোমন্দ ভেদজ্ঞান জেগেছিল। তিনজনেই চুপ করে রইলেন !

বেণু জিজ্ঞাসা করলে, 'ইস্কুলটা কে করেছিল বাবা ? জ্যেঠামশাই ? তিনি অনেক লেখাপড়া জান্‌তেন না ?'

নারায়ণ বল্লেন, 'হ্যাঁ। দাদাই করেছিলেন।'

'থাকলে ভাল হ'ত, আমরাও তাহলে হয়ত লেখাপড়া শিখতাম। ওরা সবাই বলছিল, এই আমার বন্ধুরা,' একটু অপ্রস্তুত ভাবে বেণু বল্লে।

নারায়ণও ঠিক ঐ কথাই বহুদিন ভেবেছিলেন, সত্যিই থাকলে ভাল হ'ত। হয়ত বেণুগোপাল পড়া-শোনা করত। আজ মনে হয়—কিন্তু তাঁরা তো তা চাননি। ঐকান্তিক ভাবে চেয়েছিলেন সম্পত্তিতে অধিকার ও সঞ্চয় ও একক ভোগ বিলাস। বিদ্যা দান, ভোজ্য দান, প্রসাদ বিতরণের কথা তাঁরা ভাবেন নি। গোবিন্দর কোনো রকম অধিকার থাক তা চা'ন নি তার অধিকার সত্ত্বেও। এতদিনের পব এই বিষযে কোনো কিছুই বলবার নেই। সবই স্পষ্ট হয়ে আছে সকলের কাছে। গোবিন্দ সেদিন কতখানি আঘাত পেয়েছিলেন, কেমন কবে এমন নিরাসক্ত হয়ে চলে গিয়েছিলেন, সেকথা চুপি চুপি একাকী সঙ্গোপন মন তাঁর কখনো কখনো ভেবেছে স্পষ্ট নয়—অস্পষ্ট ভাবে। সে মন প্রকাশ্যে এই বঞ্চনাকে অস্বীকার করেছে, বঞ্চিতকে অস্বীকার করেছে। এতদিন পরে সেই বঞ্চনা অন্যরূপে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল! বেণু বঞ্চিত হয়েছে জীবনের এক মহৎ সম্পদে। সেকথা আজ সে ভেবেছে। বলে ফেলেছে।

'আর করা যায় না বাবা ইস্কুল?' চন্দ্রা জিজ্ঞাসা করলে।

'ইস্কুল?' বলে নারায়ণ চুপ করে রইলেন।

বেণুও উৎসুক হয়ে চেয়েছিল। সে বল্লে, 'জ্যেঠামশায়ের নামে পাঠশালা একটা কর না বাবা?'

নারায়ণ অপ্রস্তুত ভাবে বল্লেন, 'কে পড়াবে?'

বেণুর চোখ নীচু হয়ে গেল।

৪

শ্রাদ্ধ ও চতুর্থীর জন্য নির্দ্ধারিত দিন এসে পড়ল।

বেণু ও চন্দ্রাবলী পিতাকে জিজ্ঞাসা করে, 'জ্যাঠামশাইয়ের ছবি আছে বাবা?'

'ছবি?' পিতা নির্ব্বাক হয়ে ভাবেন।

'কোনো ছবি নেই?'

'ছোট বেলার তোলা বাবার সঙ্গে একটা ছিল মনে হচ্ছে, কিন্তু সোক আর আছে?' গোবিন্দ যাঁদের আদরের ছিল তাঁরা একজন নেই, অন্য জন স্থবির অবস্থায়। তার বিয়ে হলে সব থাকত। নারায়ণ চুপ করে ভাবেন।

চন্দ্রা বল্লে, 'ঠাকুমার ঘরের বাক্সে দেখ্‌ব?'

'থাকতে পারে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করলে কি বলবে?'

'কিছু বল্‌ব না, পাইতো, দেখতে চেয়ে নেব।'

খাটো ধুতি, কালো বনাতের কোট, রেশমের ফুল কাটা টুপী মাথায়, পায়ে মোজা ও নাগরা পরা গায়ে রেশমী পাট করা চাদর দেওয়া পূর্ব্বগোঁসাই, গোবিন্দদের পিতা আর তাঁব কোলে হাত রেখে দাঁড়ানো দু ভাই বোন যশোধরা আর গোবিন্দের একখানি ম্লান বিবর্ণ হল্‌দে হয়ে আসা ছবি পাওয়া গেল।

বছর আটের গোবিন্দর মাথায় জরীর টুপী, জরীর কাজ-করা মখমলের জামা, চুড়ীদার পাজামা, আর নাগরা পরা, আর যশোধরার ঐ ধরণেই পোষাক পরা, তার উপর মাথায় বেণী, কপালে টীপ, চোখে কাজল, সর্ব্বাঙ্গে গহনা, পায়ে জুতার উপর মল পাইজোড়।

এই ছবি দেখে তারা এখনকার ছেলে মেয়ে, গোঁসাই বাড়ীর

আবহাওয়ার মানুষ হলেও কয়েক দিন আগে হ'লে হেসে ফেলত। আজ আর হাসি এলো না তাদের, গম্ভীর নির্ব্বাক গভীর দৃষ্টিতে ভাই বোনে ছবির ভাই বোনকে দেখতে লাগল।

শিক্ষিতা স্বমত অনুসারিণী রূপবতী পিতৃস্বসা, স্বেচ্ছায় অথবা অজানা কারণে দেশান্তরবাসী জ্যেষ্ঠতাত, যাদের ওরা দেখেনি বল্লেই ঠিক হয়। মনে নেই, শোনা নেই, যাদের কথা, এই তারা। অন্যের কাছে স্বল্প শ্রুত, জননীর কাছে তিক্ত মন্তব্যে শোনা, সহসা এত দিনের পর কৌতূহলে শ্রদ্ধায় প্রশ্নে জিজ্ঞাসায় খুঁজে ফেরা এই তারা!

'বড় করা যাবে ছবিটা?' একজন জিজ্ঞাসা করে।

অন্য জন বলে, 'দেখা যাক দোকানে দিয়ে।'

মনে মনে কিন্তু যেন দুজনেই ভাবে, কি হবে, কি আর হবে। যাবা নেই, যে নেই, এই তাদের সমাদর শ্রদ্ধা এ কি কোনোদিন তাদের কাছে পৌছয়! কেউ কি জানে! যদি জানানো যেত! যদি জীবিত কালে একবারও চেনা হ'ত!

বাপের কাছে গেল, ছবি পাওয়া গেছে।

রাইকিশোরী ছিলেন।

ভ্রূকুঞ্চিত করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ছবি কার? তারপর দেখলেন, বল্লেন, 'কি হবে ছবি?'

বেণুগোপাল বল্লে, 'বড় করে—বাঁধিয়ে রাখব, যদি করা যায়।'

রাইকিশোরী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর বল্লেন, 'তোমাদের দেখছি—খুব ভক্তি হয়েছে।'

বেণু ও চন্দ্রার মুখ লাল হয়ে উঠল। নারায়ণের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, কি যেন বলতে গেলেন কিন্তু বলতে পারলেন না।

ক্ষুব্ধ ভৎসর্না ভরা চোখে বেণুগোপাল জননীর দিকে চাইল।

রাইকিশোরী সে দিকে লক্ষ্যও করলেন না, বল্লেন, 'তা অত টাকা পেলে সকলেরই হয়।'

নারায়ণ একটু চুপ করে রইলেন।

তারপর বল্লেন, 'সকলের হয় না। অন্ততঃ আমার তো হয়নি। দাদারই তো সব, কই আমি তো কোনো ভক্তি বা কৃতজ্ঞতা দেখাই নি কখনো।'

নারায়ণ 'আমরা' বল্লেন না। কিন্তু এই প্রথম শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে 'দাদারই তো সব' বলে যা বল্লেন, রাইকিশোরী অবাক হয়ে গেলেন, রেগেও গেলেন। কিন্তু কোনো কথাই জবাবে তাঁর মুখে এলো না।

বিবর্ণ অস্পষ্ট হয়ে আসা ছবি বড় করা গেল না। চন্দ্রার চতুর্থীর আর বেণুগোপালের শ্রাদ্ধের আয়োজন সম্ভারে সাজানো আঙিনায় একটী চৌকীর উপর ফুলের মালা দিয়ে সাজানো সেই ছবিতে পিতার কোলে হাত রেখে দাঁড়ানো কৌতূহল ভরা উজ্জ্বল চোখ বালক গোবিন্দ হয়ত চন্দ্রা ও বেণুগোপালের দেওয়া জলপিণ্ড দান দেখল। হয়ত শুনতে পেল মন্ত্র—

"ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা"—
"আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্তং জগতৃপ্যতু।"

শেষ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

— গল্প ও উপন্যাস —

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

লাল মাটি ৪৷৷০

উপনিবেশ

১ম—২৲, ২য়—২৲, ৩য়—২৲

মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

অতীত বন্ধু ১৲

রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

কলঙ্কিনীর খাল ২৷৷০

প্রিয়কুমার গোস্বামী প্রণীত

কবে তুমি আসবে ২৷৷০

অলকা মুখোপাধ্যায় প্রণীত

নন্দিতা ১৷৷০

জগদীশ গুপ্ত প্রণীত

রোমন্থন ১৲

দুলালের দোলা ১৲

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রণীত

ছিন্নহস্ত ২৲

অমরেন্দ্র ঘোষ প্রণীত

দক্ষিণের বিল (১ম) ৪৲

সীতা দেবী প্রণীত

বন্যা ৪৲

দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

চীনের ড্রাগন ৩৲

শৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত

করুণাদেবীর আশ্রম ২৲

প্রভাত দেবসরকার প্রণীত

অনেক দিন ৩৷৷০

গিরিবালা দেবী প্রণীত

শশু-মেঘ ২৲

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রণীত

অন্ত্যেষ্টি ২৲

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত

গৌরী ১৲ **অশ্রুময়** ১৲

হীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

বিরহ-মিলন-কথা ১৷৷০

অপরাজিতা দেবী প্রণীত

শ্রীশ্রীবিশ্বকর্ম্মার জীবন-চিত্র ৫৲

অশোককুমার মিত্র প্রণীত

দু' ঘণ্টা ২৲

নিরুপমা দেবী প্রণীত

দিদি ৪৷৷০

যুগান্তরের কথা ১৸০

প্রমথনাথ বিশী প্রণীত

অল ইণ্ডিয়া

হেয়ার ইন্‌ডাসট্রি কোং ১৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,—২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬